হাকীমুল ইসলাম
হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব কাসেমী রহ.
(১৩১৫ – ১৪০৩ হিঃ)

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

হযরত ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. ১৩১৫ হিঃ মুতাবিক ১৮৯৮ ঈসায়ী সনে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দে হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ বিন মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতভী রহ এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বংশীয়ভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর বংশধর।

তাঁর সম্মানিত পিতা হাফেয মাওলানা আহমাদ ছাহেব রহ. টানা চল্লিশ বছর দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম (অধ্যক্ষ) এবং এ সময়েই চার বছর দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ রাজ্যের উচ্চ আদালতের মুফতী পদে সমাসীন ছিলেন।

তাঁর মুহতারাম দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানূতভী রহ. ইসলামী দুনিয়ার অতিপরিচিত প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তি। বিশ্ববিখ্যাত হক্কানী রব্বানী আলেম। যিনি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যাকে বর্তমানে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাঁর দাদার অসংখ্য শিষ্য ও শিষ্যদের শিষ্য ভারত ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। যাঁদেরকে "হালকায়ে দারুল উলূম" বলা হয়। এ জন্য এ খান্দানের সদস্যদেরকে সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।

ইলম অর্জন

১৩২২ হিজরীতে মাত্র সাত বছর বয়সে হযরত ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.কে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি করে দেয়া হয়। সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গানে দ্বীনের উপস্থিতিতে এক আযীমুশ শান ইজতিমায় তাঁর মকতবের বিসমিল্লাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মাত্র দুই বছরে কুরআন শরীফ, তাজবীদ ও ক্বিরাআতের পাশাপাশি হিফয সম্পন্ন করেন। পাঁচ বছরে ফার্সী, গণিত ও অংক কোর্স সম্পন্ন করেন। আর আট বছরে দারুল উলূম থেকে আরবীর নেসাব পুরো করেন। এভাবে ১৩৩৭

হিঃ মুতাবিক ১৯১৯ ইং সনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তিনি 'সনদে ফযীলত' হাসিল করেন।

তাঁর ছাত্রযমানায় দারুল উলূমের সমস্ত শিক্ষক তাঁর সাথে বংশীয় আভিজাত্য ও তাঁর বাপ-দাদার নিসবতের কারণে অত্যাধিক স্নেহ ও মায়া করতেন। এবং তাঁর তালীম-তারবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি লক্ষ্য রাখতেন।

হাদীসের খাস সনদ তিনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ আলেম ও উস্তাযদের থেকে অর্জন করেন।

অনেক বুযুর্গের হিম্মত ও নেক দু'আ তাঁর সাথে ছিল।

বিস্ময়কর মেধার অধিকারী আল্লামাতুল আসর মাওলানা আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উস্তায।

শিক্ষকতা

প্রচলিত শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করার পর তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে দারুল উলূম দেওবন্দেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অবাক করা মেধা, গভীর জ্ঞান, বংশীয় আভিজাত্য ও নিসবতের কারণে তালিবে ইলমদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

তিনি দরসে নিযামীর অন্তর্ভুক্ত ইলম ও ফনের বিভিন্ন বিষয়ে চমৎকার পাঠ দান করেন।

নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব

১৩৪১ হিজরীতে দারুল উলূমে শিক্ষকতার যমানাতেই তাঁর সামনে দারুল উলূমের নায়েবে মুহতামিম (প্রো ভাইস চ্যান্সলর)-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেটাকে তিনি নিজ মুরব্বীদের অভিলাষ ও নির্দেশ মনে করে কবূল করে নেন।

১৩৪১ হিঃ থেকে ১৩৪৭ হিঃ পর্যন্ত যতদিন তাঁর আব্বা হাফেয আহমাদ ছাহেব রহ. জীবিত ও দারুল উলূমের মুহতামিম ছিলেন, তিনি নায়েবে মুহতামিম (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল) হিসেবে দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অংশ নিতে থাকেন।

মুহতামিম পদে

১৩৪৮ হিজরীতে তাঁকে দারুল উলূমের মুহতামিম তথা অধ্যক্ষ পদে সমাসীন করা হয়। তাঁর ইহতিমামের যুগ অর্থাৎ ১৩৪৮ হিঃ থেকে ১৩৯৬ হিঃ

পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত বছরের সময়টাকে দারুল উলূমের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি স্বীয় বংশীয় আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত ইলম এবং ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্যের বদৌলতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পুরো দেশে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দকে খ্যাতির তুঙ্গে পৌঁছে দেন। অনন্য সাধারণ ইন্তিযামী যোগ্যতার বলে তিনি দারুল উলূমকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করান।

১৩৪৮ হিজরীতে যখন তিনি দারুল উলূমের ইহতিমামের বাগডোর স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেন, তখন তার ইন্তিযামী শাখা ছিল মাত্র আটটি। বর্তমানে (১৯৮০ ইং) তা বেড়ে হয়েছে ২৪টি। ১৩৪৮ হিঃ সালে দারুল উলূমের বার্ষিক আমদানী ছিল পঞ্চাশ হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা। ১৩৯০ হিজরীতে এসে তা দাঁড়িয়েছে সাড়ে বারো লক্ষ রূপীতে। ১৩৪৮ হিজরীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮০ জন। বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার। ১৩৪৮ হিজরীতে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৮ জন। বর্তমানে শতাধিক। ১৩৪৮ হিজরীতে দপ্তর ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারী ছিল ৪৫ জন। বর্তমানে তা দুইশর কোটা ছাড়িয়ে গেছে। মোটকথা প্রত্যেক শাখা তাঁর সময়ে উন্নতি লাভ করেছে। এ জন্য তাঁর খেদমতের ব্যাপারে সকলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দারুল উলূমের নির্মাণকাজ

দারুত তাফসীর জাদীদ, দারুল ইফতা, দারুল কুরআন, মাতবাখ জাদীদ, বড় দুই তলা বিশিষ্ট দারুল ইকামাহ বা ছাত্রাবাস মসজিদে ছাত্তাহ সংলগ্ন। নতুন তিনটি দরসগাহ (পাঠদানকক্ষ) বৃদ্ধি তাঁর ইহতিমামের সোনালী যুগেই হয়েছে।

দারুল উলূমের কুতুবখানা বা লাইব্রেরী যা কলমী নুসখাসমূহের ভাণ্ডার, এর মধ্যে কিতাব সংখ্যা পূর্বে ছিল ছত্রিশ হাজার তিন শত ছত্রিশটি। আর বর্তমানে তা দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

আধ্যাত্মিক অবস্থান

হযরত শাইখুল ইসলাম রহ. ১৩৪৯ হিজরীতে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব রহ.-এর নিকট বাইআত হন। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস পর শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে তিনি হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতঃপর ১৩৫০ হিজরীতে মানাযিলে সুলূক অতিক্রম

করার পর হযরতওয়ালা থানভী রহ. তাঁকে খেলাফতদানে ধন্য করেন। পরবর্তীতে হযরত থানভী রহ.-এর ইন্তিকালের পর তিনি হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনিও তাঁকে খেলাফত দান করেন।

খিতাবাত ও বয়ান

ইলমী সিলসিলায় শিক্ষকতা ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক খুতবায়ও তাঁর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতা ও ভাষার পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত। ছাত্রযামানা থেকেই বিভিন্ন মাহফিলে তাঁর বক্তৃতা সাধারণ লোকেরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে শুনত। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগাতার বক্তৃতা দেওয়া এবং প্রত্যেক আলোচনায় দলীল উল্লেখ করতে তাঁর কোনো কষ্টই হতো না। কোনো বিষয়ে তত্ত্ব, শরীয়তের হুকুমের রহস্য উন্মোচন করা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর উস্তাযগণও বিষয়টি স্বীকার করতেন।

শিক্ষিত শ্রেণীও সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁর ইলমী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে তাঁর বক্তৃতার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। হযরতের আলোচিত স্পষ্ট মতভেদ সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে লিখিতভাবে প্রকাশ করেছে। যথা : 'ইসলাম ও বিজ্ঞান'। ভারতের এমন কোনো স্থান নেই—যেখানে তাঁর বক্তৃতার গুঞ্জন পৌঁছেনি।

১৩৫৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজের সফরে হিন্দুস্তানের একজন সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে সুলতান ইবনে সাউদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি আরবীতে বক্তৃতা করেন।

এর জবাবে সুলতান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাণী দেন এবং দেশে ফেরার সময় হযরতকে শাহী পোশাক ও বেশকিছু মূল্যবান দ্বীনী কিতাব উপঢৌকন দেন। ওই সফরেই মদীনা মুনাওয়ারায় 'আল মাদরাসাতুশ শরীয়া'-এর বার্ষিক সভায় আরববিশ্বের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে তিনি আরবীতে বক্তৃতা দেন। যা উক্ত সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের সমস্ত সদস্য কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

১৩৫৮ হিজরীতে তাঁর আফগানিস্তান সফর ইলমী খেদমতের ইতিহাসে এক অনন্য স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি দারুল উলূম ও আফগানিস্তান সরকারের মধ্যে শিক্ষা ও সৌজন্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এই সফর

করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আফগানিস্তান গমন করেন। ওখানকার ইলমী হালকাগুলো হযরতকে আন্তরিক সম্ভাষণ জানায়। কাবুলের ‘আনজুমানে আদবী’, জমইয়তে উলামায়ে আফগানিস্তান এবং (মজলিসে কানূনসায)সহ অন্যান্য দল থেকে তাঁকে বয়ান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ফারসী ভাষায় বয়ান করেন—যার দ্বারা উক্ত সভায় উপস্থিত সবাই খুবই প্রভাবিত হন।

এছাড়াও তিনি মধ্যপ্রাচ্য ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রে সফর করেন। সেখানেও উচ্চমানের বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করেন।

সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক খেদমতের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান সরকারের আগ্রহে তিনি কাবুলের সমস্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ দেন—যা আফগান সরকার ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। ১৩৫৯ হিজরীতে বেলুচিস্তান প্রদেশের গভর্ণর হযরতকে শিক্ষা সিলেবাস প্রস্তুত করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি এতে সাড়া দেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ববিষয় সম্বলিত উপকারী একটি নিসাব প্রস্তুত করে দেন।

রচনাবলী

হযরতের রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা একশত পঁচিশ-এরও বেশি। এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ—

- আততাশাব্বুহ ফিল ইসলাম (দুই খণ্ডে সমাপ্ত)
- বিজ্ঞান ও ইসলাম
- তা’লীমাতে ইসলাম আওর মাসীহী আকওয়াম
- মাসআলায়ে যবান আওর হিন্দুস্তান
- দ্বীন ও সিয়াসত
- আসবাবে উরুজ ও যাওয়ালে আকওয়াম
- ইসলামী আযাদী বা মুকাম্মাল প্রোগ্রাম
- আল-ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ
- উসূলে দাওয়াতে ইসলাম
- কালিমাতে তাইয়্যেবাত (বুযুর্গানে দেওবন্দের জীবনচরিত বিষয়ক)
- ইসলামী মুসাওয়াত
- তাফসীরে সূরায়ে ফীল
- আত-তাইয়্যেবুস সামার ফী মাসআলাতিল কাযা ওয়াল কদর

- সফরনামায়ে আফগানিস্তান
- ইরফানে আরেফ
- মাকালাতে তাইয়্যেবাত
- ফিতরী হুকুমত
- তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ
- মাকালাতে আকাবিরে দেওবন্দ
- দাড়ি কী শরয়ী হাইসিয়ত
- শরয়ী পর্দা
- শানে রিসালাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- ফালসাফায়ে নামায
- ইসলাম আওর ফিরকাওয়ারিয়ত
- মাশাহীরে উম্মাত
- রেওয়ায়াতুত তাইয়্যেব
- কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ
- আফতাবে নবুওয়াত
- খুতবায়ে তাইয়্যেবাহ (শাহ আবাদ থেকে প্রকাশিত, ১৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত)

ওফাত

২ই শাওয়াল ১৪০৩ হিজরী মুতাবেক ১৭ জুলাই ১৯৮৩ সনে ৮৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

দেওবন্দের ঐতিহাসিক মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১। বায্‌মে আশরাফ কে চেরাগ
মূল : প্রফেসর আহমাদ সাঈদ রহ., পৃষ্ঠা ৭১-৭৪।
২। খুলাফায়ে হাকীমুল উম্মাত
মূল : ডা: হাফেয কারী ফুয়ূযুর রহমান
অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসূম
পৃ: ১৮৪ হতে ১৮৯ পর্যন্ত
(দারুল উলূম লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা।)

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

"ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম" হল মাদারে ইলমী আযহারে হিন্দ, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপীঠ, বিশ্ববিখ্যাত মাদরাসা, কওমী মাদরাসাসমূহের সূতিকাগার দারুল উলূম দেওবন্দের টানা অর্ধশতাব্দী কালের মুহতামিম বা অধ্যক্ষ, হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর রহ. খাস শিষ্য, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ.-এর নাতি হযরত হাফেয মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর অসাধারণ মালফূযাত বা বাণী সংকলন।

১৯৭৫ ঈসায়ী সালে বাংলাদেশ সফরে ঢাকা ও সিলেটের বিভিন্ন মাদরাসা ও মাহফিলে তিনি যে সব টুকরো টুকরো কথা বলেছিলেন, সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে এই গ্রন্থটি।

যা সংকলন করে গ্রন্থরূপ দিয়েছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম, মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসার সাবেক শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা রিযাউল কারীম ইসলামাবাদী রহ.। আল্লাহ তাআলা হযরতকে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং তাঁর কবরকে আপন রহমতে শীতল রাখুন। আমীন।

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে যখন আমি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসার নিচের জামাআতের ছাত্র, তখন একদিন শখের বশে ফুটপাতের জনৈক বৃদ্ধ পুস্তকবিক্রেতার কাছ থেকে মূল কিতাবটি ক্রয় করি। মাঝে মাঝে মুতালাআ করি। ভালই লাগে। এভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য আমার যাওয়ার সুযোগ হল দারুল উলূম দেওবন্দে ১৯৯৮ ঈসায়ী মোতাবিক ১৪১৮ হিজরী শিক্ষাবর্ষে। আশৈশব লালিত স্বপ্ন হল বাস্তব। মাঝে মধ্যে বন্ধুবর মাওলানা মুফতী নিছার আহমাদ (বর্তমান মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস দেওভোগ মাদরাসা মুন্সীগঞ্জ)-এর সাথে যেতাম দারুল

উলূম ওয়াক্ফ দেওবন্দে হযরত হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর দুই সুযোগ্য পুত্র মাওলানা সালেম কাসেমী ও মাওলানা আসলাম কাসেমী রহ.-এর দরসে হাদীসে শরীক হওয়ার জন্য। তাঁদের ভরাট কণ্ঠের স্পষ্ট উচ্চারণগুলো এখনও বিশ বছর পর কর্ণকুহরে গুঞ্জন সৃষ্টি করে। তখনই বুঝে এসেছে বিখ্যাত ঐ প্রবাদটি : বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেই পরিচয়।

মূলত হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. ছিলেন إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا "নিশ্চয়ই কিছু কিছু বয়ান যাদুর মত"। (সহীহ বুখারী) হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিশাল দশখণ্ডে মুদ্রিত "খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম"। (বইঘর প্রকাশনী, বাংলাবাজার এর অনুবাদ প্রকাশ করেছে) আমাদের এ দাবীর জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.কে সরাসরি খুব নিকট থেকে দীর্ঘদিন দেখেছেন, এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তির মুখে আমরা শুনেছি যে, হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. মাত্র একটি বিষয়ের উপর টানা এক বছর পর্যন্ত অনর্গল বয়ান করতে পারতেন।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

এছাড়া আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বার মুখেও হযরত ক্বারী তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর আজীব বয়ানের আলোচনা শুনেছি। যা তিনি ১৯৭৫ ঈসায়ী সালে ঢাকার ঐতিহাসিক আরমানীটোলা ময়দানে করেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিনপতন নীরবতার মধ্যে, পীযূষবর্ষী কণ্ঠে, সাবলীল ভঙ্গিতে তাঁর ইরশাদাত-বায়ানাত-খুতুবাত ও মালফূযাতের ধারা অব্যাহত থাকত। হাজার হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর ফেরেশতাসুলভ নিষ্পাপ নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকত। এ সমস্ত মূল্যবান ইলমী তাহকীকসমৃদ্ধ বয়ান ও বাণীর উসীলায় আওয়াম-খাওয়াস নির্বিশেষে কত মানুষ যে কতভাবে উপকৃত হয়েছেন এর শেষ নেই। মূলতঃ এগুলো হল হযরত মরহুম হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর 'সাদাকায়ে জারিয়া' এবং عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ 'ঐ ইলম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়'। (সহীহ মুসলিম ও জামে তিরমিযী)

কিয়ামত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ আদমসন্তান এ সবের মাধ্যমে উপকৃত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা হযরত হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। তাঁর উলূম ও মাআরিফ থেকে যুগ যুগ তৃষ্ণার্ত ইসানিয়্যাতকে ইলমী তৃষ্ণা নিবারণ করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

আর আমাদের এবারের ছোট্ট আয়োজন "ارشادات حکیم الاسلام" বা ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম-এর অনুবাদকেও কবূল ও মাকবূল করুন। আমীন।

অনুবাদ সংশ্লিষ্ট যে কোন বিচ্যুতি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে তাম্বীহ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

তারিখ
০৭-১১-১৪৩৯ হিঃ
২০-০৭-২০১৮ ইং

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.

শাইখুল হাদীস আল্লামা আনযার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর পবিত্র কলমে

হযরত মাওলানা আনযার শাহ কাশ্মীরী রহ. (সাবেক শাইখুল হাদীস দারুল উলূম ওয়াক্‌ফ দেওবন্দ) হাকীমুল ইসলাম হযরাতুল আল্লাম ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব, মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ -এর পরিচয় পেশ করতে গিয়ে লিখেন : হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানূতভী রহ. প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলূম দেওবন্দের নাতি, হযরত মাওলানা হাফেয আহমাদ ছাহেব রহ.-এর বড় ছেলে, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য, হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর অন্যতম খলীফা, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম, যুগের অতুলনীয় বক্তা, যাদুবয়ান ওয়ায়েয। যদি মানবতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, বিনয় ও নম্রতা শারীরিক কোন আকার আকৃতি ধারণ করতে পারত, তাহলে এর সন্ধানে বেশি ঘুরাফেরার প্রয়োজন নেই। সে হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর আকৃতিতেই বিদ্যমান।

মেযাজ এত ভাল যে, বাচ্চাদের সাথে থাকলে "হেকায়েতে লতীফ", যুবকশ্রেণীকে নসীহত প্রদানে উদ্যত হলে "আখলাকে মুহসিনী" চিত্তাকর্ষক ও উপদেশপূর্ণ ঘটনা শোনানোর সময় "গুলিস্তাঁ" কবিতাবদ্ধ হেদায়েতের দরওয়াযা খোলা হলে "হাস্তে কুরআন দর যবানে পাহলভী", ধৈর্য ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে উচ্চতার ঐ ঝাণ্ডা ধারণকারী যে, তাঁর সমালোচকরা পর্যন্ত তাঁর এসব গুণের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

দেওবন্দের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমি অধমকে বলেছেন যে, "আমি মুহতামিম ছাহেব রহ.-এর যে পরিমাণ সমালোচনা করেছি, যদি এর দশভাগের এক ভাগও অমুক ব্যক্তিকে বলতাম, তাহলে তিনি আমাকে নির্মূল করে ছাড়তেন।"

তাঁর তবিয়ত এমনই সূক্ষ্ম ছিল যে, তাঁর কথাবার্তা ও আলোচনাকে মনে হত সুদৃশ্য ধারাবাহিক মালার এক একটি দানা। কথা এত মিষ্টি ছিল যে, আজ পর্যন্ত শব্দের কঠোরতা, উচ্চারণভক্তির তিক্ততা তাঁর যবানের মিষ্টতার উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। অর্ধশতাব্দী যাবত তিনি দারুল উলূমের কাফেলার সর্বাধিনায়ক। শত শত কর্মচারীর 'রঈসে আলা'। এই অর্ধ শতাব্দীতে বহু মানুষ এসেছে ও চলে গেছে। কিন্তু কারো অন্তর তাঁর প্রতি বিষণ্ন হয়নি। কারো মুখে তাঁর ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই।

পঞ্চাশ বছরের এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি দারুল উলূমের শুধু স্থাপত্যই বাড়াননি বরং এর পরিচিতির মূলে রয়েছে তাঁর ক্ষুরধার কলম, যাদুবয়ান ও তাঁর মজলিস-এর ফয়েয। তিনি নিজ পবিত্র যবানে আকাবিরীন হাযারাতকে "চির জীবন্ত" বানিয়েছেন। এবং ইতিহাসের ধূসর পৃষ্ঠার অসংখ্য মনীষীকে তুলে এনেছেন। যখন শিক্ষকতার আসনে বসলেন, তখন জ্ঞানের উত্তালসমুদ্র প্রমাণিত হলেন। ইহতিমামের দায়িত্ব নিলেন তো ব্যবস্থাপনা জগতের "জীবন্ত কিংবদন্তী"তে পরিণত হলেন। সাধারণ মানুষ তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। উলামায়ে কেরাম তাঁর মজলিসে বসে রূহের খোরাক সঞ্চয় করেন। গাম্ভীর্য হল তাঁর ভূষণ। উপস্থাপনার সৌন্দর্য তাঁর হাতের খেলনা। তাঁর প্রসিদ্ধি জগতের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর এখন কলম তাঁর পরিচয় প্রদানে কোন অনুসন্ধানের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা ও দু'আ করতে কী সমস্যা

تم سلامت رہو ہزار برس + ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار

অর্থাৎ, আপনি সুখে থাকুন হাজারো বছর
প্রতি বছরের দিনগুলো হোক পঞ্চাশ হাজার বছর

বিনীত
–আনযার শাহ বিন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.
দারুল উলূম ওয়াক্‌ফ দেওবন্দ, ভারত।

সংকলকের কথা

হাকীমুল ইসলাম আল্লামা হাফেয ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দের বিভিন্ন বক্তব্য ও মালফূযাতের এটা একটি নির্বাচিত সংকলন। যেটাকে "ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম" নামে পেশ করা হচ্ছে।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সফরের সময় ঢাকা ও সিলেটের বিভিন্ন মাদরাসাও মাহফিলে তিনি এ সব তাকরীর করেন। ঐ সফরে এ সংকলকের হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর পবিত্র সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হাসিল হয়। যথাসাধ্য তাঁর মালফূযাত ও মূল্যবান কথাগুলো কলমবন্দ করার চেষ্টা করি।

এটা সবাই জানেন যে, হযরতের বক্তব্য ও কথাসমূহ হেকমতে ভরপুর থাকে। যেহেতু তিনি "হাকীমুল ইসলাম"।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সব মালফূযের প্রচার-প্রসার কওম ও মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

ফিলহাল এ মহামূল্যবান বক্তব্যসমূহের কিছু নির্বাচিত ইরশাদাত বা কথাগুলোকে আমরা পাঠক ও ভক্তবৃন্দের খিদমতে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

বাস্তব কথা হল, হযরতের প্রতিটা বাক্য, প্রতিটি মালফূয দুর্লভ মুক্তার মত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ এ সংকলনের দ্বারা আওয়াম-খাওয়াস তথা সর্বস্তরের মানুষের উপকার হবে। এবং এই সংকলন উপকারী প্রমাণিত হবে।

সংকলন বা মূলপাঠে যদি কোন অসঙ্গতি কারো নযরে পড়ে, তাহলে এর জন্য আমি অধম সংকলকই দায়ী। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর পবিত্র সত্তাকে এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত মনে করতে হবে।

সংকলক
মুহাম্মাদ রিযাউল কারীম ইসলামাবাদী
১২ রবিউল আউয়াল ১৪০০ হিঃ

সূচিপত্র

১. ইসলাম চিরন্তন এক ধর্ম ১৭
২. দুআর আদাব ও শর্তসমূহ ১৮
৩. ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর সদ্ব্যবহার ২১
৪. আল্লাহর দর্শন ও শাইখ শিবলী রহ. ২১
৫. প্রসঙ্গ : তাকদীর ২৩
৬. সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য ২৪
৭. তিন মারকায ২৭
৮. আমল, হাল এবং মাকাম ২৭
৯. নামের ব্যাপারে কৌতুক ২৯
১০. চাঁদে পৌঁছা ২৯
১১. ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান ৩০
১২. ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় দুআ ৩১
১৩. দারুল উলূম দেওবন্দ আলোর মিনার হয়ে গেছে ৩২
১৪. হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ.-এর ব্যাপারে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মালফূয ৩৩
১৫. ইলম ও সম্পদ ৩৩
১৬. হযরত কাসেম নানূতভী রহ. ৩৫
১৭. আমলের পেনশন ৩৬
১৮. ঈমানের হাকীকত হল মহব্বত ৩৬
১৯. বাইআতের উপকারিতা ৩৯
২০. দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশ হাদীসের মধ্যে ৪০
২১. কবর যিয়ারতের সময় হাত উঠানো ৪০
২২. জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি ৪০
২৩. কথা বেশি আমল কম ৪২
২৪. সামা' সঙ্গীত নাজায়েয ৪৩
২৫. ওয়াহাবী ৪৩
২৬. নামাযের পর মুনাজাত ৪৩
২৭. ইলম এবং জাহালাত ৪৪
২৮. একটি কৌতুক ৪৪
২৯. আকাবিরে দেওবন্দের নিসবত ৪৪
৩০. ইসলাম ও বর্তমান সভ্যতা ৪৫
৩১. হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ৪৬

৩২. জনৈক দাড়ি মুণ্ডনকারীর মনোরঞ্জন ৪৮
৩৩. ভাল মানুষ ছাড়া ভাল নীতি বেকার ৪৮
৩৪. রাত্রের নাস্তা (?) ৪৮
৩৫. ইনসাফ ৪৯
৩৬. তাওয়াক্কুল ৪৯
৩৭. দেশে বেবরকতী কেন ছড়িয়ে পড়ে? ৪৯
৩৮. আপত্তি তোলা সহজ ৪৯
৩৯. কুরআনে কারীমকে যে মানসিকতা নিয়ে দেখবে, ফলাফলও সেরকমই পাওয়া যাবে ৫০
৪০. দুনিয়ার জন্য কম এবং আখেরাতের জন্য বেশি কাজ করুন ৫০
৪১. আমরা দাসত্ব অর্জন করেছি প্রভুত্ব নয় ৫১
৪২. ইসলামের 'শাসক' প্রজাদের আমল-আখলাক এমনকি ঘরোয়া যিন্দেগীরও দায়িত্বশীল হন ৫২
৪৩. নারীদের শিক্ষা ৫৩
৪৪. পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে জনৈক অমুসলিম ব্যক্তির মন্তব্য ৬০
৪৫. আসল ইবাদত হল নামায ৬০
৪৬. ফিতনার সময় করণীয় ৬১
৪৭. চার শ্রেণী আল্লাহ পাকের পুরস্কারের যোগ্য ৬১
৪৮. দেশের উন্নতির ভিত্তি হল চারটি জিনিস ৬২
৪৯. সুন্নাতের উপর আমল করলে অভ্যাসগত কাজও ইবাদতে পরিণত হয় ৬৩
৫০. ইসলামের প্রতিটি আমলের মধ্যে দুটি দিক আছে ৬৪
৫১. হুকুমের অনুসরণই ইবাদত ৬৫
৫২. মানুষের ব্যক্তি সত্তায় কোন কৃতিত্ব নেই ৬৭
৫৩. ইসলামের সহজ পথ ৬৮
৫৪. আল্লাহর ওয়াস্তে আমল হওয়ার জন্য দুটো জিনিস জরুরী ৬৯
৫৫. আল্লাহ তাআলার ইবাদত কেন করা হবে ? ৭১
৫৬. গাইরুল্লাহর মধ্যে কার সম্মান জরুরী? ৭৩
৫৭. আমল কবূল হওয়ার জন্য ইখলাসের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণও জরূরী ৭৫
৫৮. একমাত্র মুহাম্মাদী আদর্শই টিকে আছে ৭৬
৫৯. তাউহীদের শক্তি ও শিরকের অসারতা ৭৬
৬০. জগতের সমস্ত সম্প্রদায়ের সংশোধনের দায়িত্বশীল হলেন মুসলমানগণ ৭৭
৬১. বান্দার নিজ আমিত্ব খতম করে দেওয়া উচিত ৭৮
৬২. নামের মুসলমান এবং কাজের মুসলমান ৭৯

১. ইসলাম চিরন্তন এক ধর্ম

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ইসলাম হল চিরন্তন এক ধর্ম। ইয়াহুদ ও খ্রীস্টানদেরকেও কিতাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ সব কিতাবের ইলম টিকে থাকেনি। ফলশ্রুতিতে ধর্মও টিকেনি। এখন যা কিছু আছে তা হল প্রথামাত্র। এসব প্রথার কোন বাস্তবতা নেই।

ইসলাম চিরন্তন এক ধর্ম। এর শিক্ষা চিরন্তন। ধর্মের ভিত্তি হয় শিক্ষার উপর। ইসলামের ভিত্তি মযবূত পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটা হেলতে পারে না।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ

"তোমাদের জন্য আমি দুটো ওজনদার বস্তু রেখে যাচ্ছি। একটি হল আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে কারীম। আর অপরটি হল রাসূলের সুন্নাত।"

(মুআত্তা মালিক)

তুফানের সময় কেউ গাছ বা বাড়ীতে আশ্রয় নিল। এখন যদি ঐ গাছ বা বাড়ী ভেসে যায়, তাহলে ঐ আশ্রয় গ্রহণকারীও ভেসে যাবে। কিন্তু যদি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সে ভেসে যাবে না।

রেওয়াজ ও সোসাইটি নিত্যনতুন পরিবর্তন হয়। কিন্তু ধর্মের রীতিনীতি পরিবর্তিত হয় না।

ইসলাম ইবাদত ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী এক অনবদ্য ধর্ম। আমীরুল মুমিনীন মুসল্লাতেও আছেন আবার খেলাফতের আসনেও আছেন। ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহর বান্দা হয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করা হয়।

বনী ইসরাঈলের নবীদের এক সিলসিলা ছিল। তাঁরা বিধান দিতেন এবং রাজা বাদশাহদের দ্বারা সেগুলো কার্যকর করা হত।

ইসলাম উভয়টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে জগতের মুরব্বী ও মুসলিহ (সংশোধনকারী) তেমনিভাবে তিনি জগতের বাদশাহও বটে। আনুগত্যকারীদের জন্য তিনি রহমত তো অবাধ্যদের ক্ষেত্রে তাঁর হাতে তলোয়ারও আছে।

মুসলমানদের দায়িত্ব হল আল্লাহ পাকের ইবাদতে মাশগুল থাকা এবং আল্লাহ পাকের নায়েব বা প্রতিনিধি হয়ে মানুষের সংশোধন করা। এটা ইসলামের সার্বজনীনতা যে, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের উপর ধর্মের নাম রাখা হয়েছে। মুহাম্মাদী বা আরবী বলেননি। "মুসলিম" বলেছেন যার অর্থ : হকের আনুগত্যকারী। গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়া। এর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সকলকে মুসলমান বলা হবে। 'নাসরানী'-'ইয়াহুদী- বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু 'মুসলিম' এর মধ্যে এ ব্যাপার নেই।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

"তথা সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই" (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০)।

পূর্বের হোক বা পশ্চিমের, আসামের হোক বা বাঙ্গালের, ইরানের হোক বা তুরানের।

بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَ الْأَحْمَرِ

অর্থাৎ "আমি কালো ও লাল সবার কাছেই প্রেরিত হয়েছি।" (মুসনাদে আহমাদ)

সাদা হোক বা কালো সবাই আমার আপন।

ইসলামের কালিমা হল আমাদের বন্ধন। এর মাধ্যমেই ঈমানদারদের সম্মান ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

২. দুআর আদাব ও শর্তসমূহ

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً

অর্থাৎ "তোমরা কাকুতি মিনতির সাথে ও চুপে চুপে তোমাদের প্রভুর নিকট দুআ করো।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫৫)

এমন চুপে চুপে দু'আ করবে যেন আওয়াযও শোনা না যায়। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে উচ্চস্বরেও দু'আ করেছেন। সেটা ছিল উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। নতুবা কাকুতি মিনতি, চুপে চুপে এবং আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক রেখে দুআ করা উচিত।

ইরশাদ হয়েছে :

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝

অর্থাৎ "এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দাহ যাকারিয়্যার প্রতি। যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলেন নিভৃতে।" (সূরা মারয়াম, আয়াত ২-৩)

হযরত যাকারিয়্যা আ. যে দুআ করেছিলেন তাতে আওয়াজ ছিল কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ। হয় তাঁর অন্তর শ্রবণ করছিল বা আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলার আদবসমূহ আম্বিয়ায়ে কিরামই আ. সব থেকে ভাল বুঝেন। প্রথমেই এটা বলেননি যে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে ছেলে সন্তান দান করুন। বরং অবস্থা বর্ণনা করা আরম্ভ করেছেন :

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَیْبًا

"হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জল হয়েছে।" (সূরা মারয়াম, আয়াত ৪)

অর্থাৎ আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই বার্ধক্য ছেয়ে গেছে। কিন্তু আমি হতাশ হইনি। আমার এই আশা নেই যে, আমার আত্মীয়-স্বজন (উত্তরাধিকারীগণ) আমার পরে আমার কাজ আঞ্জাম দিবে। আমার মিশন জারী রাখার ব্যাপারে তাদের আর কী ফিকির? উত্তরাধিকারীগণ তো সম্পদ দখল করার ফিকিরে থাকে।

ছেলের প্রার্থনা এখনো করছেন না। এখনো পর্যন্ত অবস্থার বিবরণ চলছে।

وَ کَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا

"আর আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা"। এ দিকে আমি হয়ে গেছি বৃদ্ধ। সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতা আমার নেই।

এখন দরখাস্ত করছেন فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا "সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে উত্তরাধিকারী দান করুন"। وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا "এবং হে প্রতিপালক! তাকে করুন সন্তোষ ভাজন।" (সূরা মারয়াম, আয়াত ৫, ৬)

ছেলে আপনার পসন্দনীয় হতে হবে। আওয়ারা প্রকৃতির না হতে হবে, যে পিতামাতার জন্য মনোকষ্টের কারণ হয়। বরং এমন হবে যাকে দেখে তার পিতামাতা সন্তুষ্ট হয়।

কেমন আজীব হেকমতে দু'আ প্রার্থনা করেছেন। যদি শুরুতেই ছেলে প্রার্থনা করতেন, তাহলে উত্তর আসত : আপনি বৃদ্ধ। আপনার স্ত্রী বন্ধ্যা। ছেলের প্রার্থনা করছেন কেন? আপনি কি তাহলে নিয়ম ভঙ্গ করতে চান? এটা বে আদবী। খামুশ হয়ে যান। এটা অসম্ভব। এটা আল্লাহ তাআলার রীতিনীতির পরিপন্থী। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কাউকে বানিয়ে নিন।

সম্ভাবনা ছিল এটা বলার যে, আমি দিতে চাই না। এজন্য বলেছেন,

وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِیًّا۝

"আপনার নিকট প্রার্থনা করে আমি কখনো বঞ্চিত হইনি।"

(সূরা মারয়াম, আয়াত ৪)

আবার এ সম্ভাবনাও ছিল যে, সন্তান হয়ত দিবেন কিন্তু সে হবে অবাধ্য সন্তান। এজন্য বলেছেন,

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۝

"হে আমার প্রভু! তাকে আপনার পসন্দনীয় বানিয়ে নিন।"।

(সূরা মারয়াম, আয়াত ৬)

প্রথমে সমস্ত অসুবিধাগুলো বর্ণনা করেছেন। ফলশ্রুতিতে উত্তর আসল :

یٰزَكَرِیَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ

"হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। অসাধারণ ছেলে দিব। এ জন্য নামও ঠিক করছি দুর্লভ নাম"।

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا۝

"এই নামে আমি পূর্বে কারো নামকরণ করিনি"। (সূরা মারয়াম, আয়াত ৭)

এখন চিন্তা হল, সন্তান হবে কিভাবে? আমার মধ্যে তো শক্তি নেই।

قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ ـ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ

অর্থাৎ, "তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! কেমন করে আমার পুত্র হবে? আল্লাহ বলেন, এভাবেই হবে। আপনার প্রতিপালক বলেন : এটা আমার জন্য সহজ।" (সূরা মারয়াম, আয়াত ৭)

তো দু'আর জন্য আদাব আছে। প্রথম আদব হল চুপে চুপে দুআ করবে। দ্বিতীয় আদব হল অনুনয় বিনয়ের সাথে দুআ করবে।

আর দুআর মধ্যে ইখলাস পূর্বশর্ত। একমাত্র আল্লাহপাকের দিকেই মনোযোগ থাকতে হবে। আসবাবের উপর যেন নযর না যায়। যার কাছে দুআ করছ তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। কাজেই বেপরোয়াভাব নিয়ে দুআ করা যাবে না। এমন যেন না হয় যে, হাত আল্লাহর সামনে অথচ অন্তর দোকানে বা ক্ষেতের মধ্যে।

দুআ প্রার্থনা করতে হবে অস্থির হয়ে অপারগ হয়ে। এমনভাবে দুআ করতে হবে যে, আমাকে আল্লাহ পাক থেকে নিতেই হবে। আমি প্রার্থনাকারী। আপনি প্রদানকারী। আপনার ভাণ্ডার অসীম। তাহলে আমি বঞ্চিত হব কেন?

এমন কাকুতি মিনতির সাথে যে দুআ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই দিবেন। দুআর মধ্যে বেশি শর্ত এবং পাবন্দী লাগাবে না। এটা বেআদবী।

একজন দুআ করল : "হে আল্লাহ! জান্নাতে আমি আপনার নিকট সাদা প্রাসাদ প্রার্থনা করছি।"

এসব কয়েদ লাগানোর কোন প্রয়োজন নেই। যখন জান্নাত দিবেন, তখন সমস্ত নেয়ামতই এর মধ্যে থাকবে। আল্লাহ পাক আপনাকে জান্নাতে যেটা দিবেন সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এসব শর্ত বা কয়েদ যুক্ত করে তো আপনি নেয়ামত হ্রাস করছেন।

যাইহোক, দুআর মধ্যে ইখলাসও থাকতে হবে। কাকুতি মিনতিও থাকতে হবে। আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্কও থাকতে হবে। নিয়্যতও ঠিক থাকতে হবে। তাহলে এই দুআ অবশ্যই কবূল হবে।

৩. ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর সদ্ব্যবহার

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ.কে কেউ একজন গালী দিল। ইমাম ছাহেব জানতে পারলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। সম্পদশালী ছিলেন। রেশমের ফ্যাক্টরী ছিল। ইমাম ছাহেব বড় একটি থালা নিলেন, এর মধ্যে রেশমী কাপড়ের থান ও মিষ্টান্ন নিলেন এবং সেটা উঠিয়ে তার ঘরে পৌঁছে দিলেন। সে ইমাম ছাহেবকে দেখে কেঁপে উঠল। ইমাম ছাহেব বললেন, “ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। আমি জানতে পারলাম যে, আমার উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। সেটার প্রতিদান দিতে এসেছি”। সে লজ্জিত হল এবং ইমাম ছাহেবের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। এবং সারা জীবনের জন্য তাঁর ভক্ত হয়ে গেল।

৪. আল্লাহর দর্শন ও শাইখ শিবলী রহ.

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ‘মু’তাযিলা একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের নাম। তাদের মাযহাব হল “আল্লাহ তাআলার দর্শন অসম্ভব।” দুনিয়াতেও অসম্ভব। আখেরাতেও অসম্ভব।

পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাযহাব হল : আল্লাহ পাকের দর্শন নসীব হবে। জীবন ভর এ আশাতেই তো ইবাদত করছি।

ইরশাদ হচ্ছে :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

অর্থাৎ, “সে দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে। যারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ২২-২৩)

কিয়ামতের দিন মুমিনদের চেহারা চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

কাফেরদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে।

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾

অর্থাৎ “কখনও নয়! নিশ্চয়ই তারা সে দিন তাদের প্রতিপালকের দীদার (দর্শন) থেকে বঞ্চিত থাকবে।” (সূরা তাতফীফ, আয়াত ১৫)

যাইহোক, আমাদের মাযহাব এটাই যে, আল্লাহ তাআলার দীদার বা দর্শন নসীব হবে। বিভিন্ন তাজাল্লীর সাথে আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান হবেন। আল্লাহ পাকের দরবার অনুষ্ঠিত হবে। জান্নাতে প্রতি সপ্তাহে দীদার হবে।

সহীহ মুসলিমের হাদীসের মধ্যে এ দীদারের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি দেখবে। সবাই একই মুহূর্তে দীদারের মাধ্যমে পুলকিত হবেন। একজনের দেখা অন্যজনের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। যেমন পূর্ণিমার চাঁদ লণ্ডনওয়ালারাও দেখে। বার্লিনওয়ালারাও দেখে। বার্মাওয়ালারাও দেখে। ঢাকাওয়ালারাও দেখে।

এক সময় এ নিয়ে মারাত্মক ফিতনা হল। মু‘তাযিলা সম্প্রদায় দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা আরম্ভ করল। কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহের উপর আপত্তি উত্থাপন করা আরম্ভ করল। উলামায়ে কিরাম সেগুলোর জবাবও দিয়েছেন। বিশেষ লোকেরা বুঝে ফেলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ আক্রান্ত ছিল। লোকজন প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত শিবলী রহ.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : হযরত! আমরা একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছি। এবার আপনি হস্তক্ষেপ করুন। তিনি বললেন : “ইলান করে দাও যে, আগামী জুমুআর দিন রসাফা জামে মসজিদে আমরা বহছ করব”। সবাই হতবাক হল যে, শাইখ মুনাযারা তথা বিতর্ক করবেন! তিনি তো বক্তৃতাই দেননা। মুনাযারা তো অনেক পরের ব্যাপার!

অনেক মানুষ একত্রিত হল। শাইখ শিবলী রহ. মিম্বারে উপবেশন করলেন। মু‘তাযিলা সম্প্রদায়ের আলেমদেরকে সামনে বসিয়ে দেয়া হল। শাইখ জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের দাবী কী? মুতাযিলাগণ উত্তর দিল : “আল্লাহ তাআলার দীদার অসম্ভব। দীদার হতেই পারে না”।

শাইখ শিবলী রহ. বললেন যে, আচ্ছা আমি তোমাদের নিকট জানতে চাই যে, তোমাদের মনেও কি আল্লাহ তাআলাকে দেখার আগ্রহ হয়? তারা বলল যে, হ্যাঁ, মনে তো চায়। শাইখ বললেন : এর দ্বারা তো বুঝে আসে যে, দেখা সম্ভব। নতুবা দেখার আকাঙ্ক্ষা হত না। যাকে দেখা সম্ভবই নয়। কখনোই তার জন্য অন্তরে অভিলাষ সৃষ্টি হবে না। দেখার মত জিনিস হলেই চোখে আকাঙ্ক্ষা জাগবে। চোখের দ্বারা শোনার আকাঙ্ক্ষা হবে না। কানের দ্বারা আওয়ায শোনার আকাঙ্ক্ষা হবে। আকৃতি দেখার আকাঙ্ক্ষা হবে না। যে জিনিসের ঘ্রাণ নেয়া যায়, নাকের মধ্যে সেটা শূঁকার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে।

শাইখ বললেন : তোমাদের এই আগ্রহের দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ পাককে দেখা সম্ভব। আর এটা যে হবেই সেটা প্রমাণিত হয়েছে সত্যবাদী সংবাদ প্রদানকারী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের দ্বারা।

এখন বলো তোমাদের আপত্তি তোলার কী অধিকার?

অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই আসল সাক্ষ্য। দিলের আওয়ায বড় সত্য আওয়ায। ইরশাদ হচ্ছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মত যোগ্যতা দান করবেন।"

(সূরা আনফাল, আয়াত ২৯)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ

"সর্বপ্রথম নিজের কলবকে জিজ্ঞেস করো"। (মুসনাদে আহমাদ)

স্বীয় দিল থেকে ফতওয়া গ্রহণ কর। অন্তর বা মন যেদিকে চলে, বুঝতে হবে সেটাই আসল জিনিস।

৫. প্রসঙ্গ : তাকদীর

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : লোকেরা বলে : তাকদীরের পরে পুরস্কার এবং শাস্তির বিধান কেন? পুরস্কার বা শাস্তি তো এই জন্যই যেহেতু মানুষকে আল্লাহ তাআলা স্বাধীন বানিয়েছেন। যদি মানুষ পাথরের মত হত, তাহলে তাকে শরয়ী সম্বোধন করা হত না। যদি তোমাকে গ্রেফতার করে কোন জজের আদালতে পেশ করে দেয়া হয় এবং তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা হয় এবং তোমাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তখন তুমি আত্মরক্ষার চিন্তা কেন কর? বুঝা গেল যে, তোমার মধ্যে স্বাধীনতা আছে। তুমি অন্যায় লুকানোর ফিকির কর। এটাই প্রমাণ যে, কাজ তোমার এখতিয়ারভুক্ত। তুমি যদি ইট পাথরই হও তাহলে মুক্তির চিন্তা কর কেন? উকীল নিযুক্তকরণ এবং আদালতে জেরা কেন? এটাই মানুষের কাজের স্বাধীনতার প্রমাণ। এমনিভাবে দ্বীনের ব্যাপারটাকেও বুঝতে হবে। দুনিয়ার ব্যাপার হলে আপনি স্বাধীন আর শরীয়তের ব্যাপার হলে আপনি অপারগ। এটা কেন? অপারগ হলে উভয় স্থানে অপারগ হবে। শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে। আত্মরক্ষার ফিকির করা যাবে না। আর স্বাধীন হলে উভয় ক্ষেত্রে স্বাধীন হবে।

একটা কুকুরও জানে যে, মানুষ স্বাধীন। কুকুরকে ঢিল মারলে সে ঢিল নিক্ষেপকারীর দিকে দৌড়াবে। ঢিলার দিকে দৌড়াবে না। অবশ্য মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয় আবার সম্পূর্ণ অপারগও নয়। কতটুকু স্বাধীনতা আর কতটুকু অপারগতা সেটা মাপার কোন দাঁড়িপাল্লা আমাদের নিকট নেই।

হযরত আলী রাযি.-এর নিকট কেউ একজন জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি স্বাধীন? স্বাধীন হলে কতটুকু স্বাধীন? তখন হযরত আলী রাযি. ঐ প্রশ্নকারীকে বললেন যে, তুমি এক পা উঠাও। সে নিজের পা উঠাল। হযরত আলী রাযি. বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে থাক। অতঃপর বললেন যে, দ্বিতীয় পা টিও উঠাও এবং দাঁড়িয়ে থাক। সে উঠাতে পারল না। এ ব্যাপারে সে অক্ষম ছিল।

হযরত আলী রাযি. বললেন : "এর মাধ্যমেই তুমি অপারগতা ও স্বাধীনতার ব্যাপারটি বুঝে নাও"।

৬. সাহাবায়ে কিরামের মতপার্থক্য

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, উম্মতের সব থেকে বড় ওলীও সাহাবিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। তাঁদের নেক নিয়্যত, দিলের তাকওয়া স্বীকৃত বিষয়। তাঁদের ভুল হল ইজতিহাদী ভুল। যার উপর একটি সাওয়াব পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরামের রাযি. পারস্পরিক মতভেদ নিয়্যত খারাপ হওয়ার উপর নির্ভর করে না বরং এটা হল ইজতিহাদী ভুল।

ইরশাদ হচ্ছে,

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣

অর্থাৎ, "এরা (সাহাবায়ে কিরাম) ঐ সব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাক্বওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করছেন। তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা ও মহান পুরস্কার"। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ
رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٠٠

অর্থাৎ " আর যে সকল মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রাযী হয়েছেন আর তারা সকলে তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। যার

তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা বিরাট সাফল্য।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১০০)

এটা কুরআনী ঘোষণা, সন্তুষ্টির ঘোষণা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। সাহাবায়ে কিরামও মহান আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট, আবার মহান আল্লাহও তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। মাঝখানে ফাটল সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

পবিত্র কুরআন তাঁদের অভ্যন্তরীণ তাক্বওয়া এবং অন্তরের পবিত্রতার উপর চাক্ষুষ সাক্ষী। স্বয়ং আল্লাহ প্রশংসা করছেন। অতএব অন্য কেউ তাঁদের সমালোচনা করার অর্থ হল আল্লাহ পাকের সাথে মোকাবেলা করা। পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করা।

ইয়াযীদ প্রসঙ্গ : নিয়ম হল, খেলাফতের জন্য ঐ ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা যিনি এর উপযুক্ত। ইয়াযীদকে খলীফা নির্ধারণ করা ঠিক হয়নি ।

এ ক্ষেত্রে বেশির থেকে বেশি এটা বলা যেতে পারে যে, সে এ পদের উপযোগী ছিল না। কিন্তু সমস্যা হল পুরো বনী উমাইয়াহ হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি.-এর সাথে ছিল। তাকে পরবর্তী খলীফা ঘোষণা করা না হলে বনী উমাইয়াহ উম্মতের মধ্যে এক তুফান সৃষ্টি করত।

ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় রাজনীতিতে অনপোযুক্ত মানুষকেও সামনে বাড়িয়ে দেয়া হয়।

হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি. সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

صَاحِبُ سِرِّيْ مُعَاوِيَةُ

তথা "মুআবিয়া হল আমার গোপনভেদ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি।"

(আর রিয়াযুন নাযিরাহ লিততবারী)

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে সুধারণা রাখা উচিত।

হযরত হাসান বিন আলী রাযি. যখন খিলাফতের দায়িত্ব হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলেন, তখন হযরত মুআবিয়া রাযি. তাঁর সাথে খুব ভালো আচরণ করেছিলেন।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের এই মতভেদের ক্ষেত্রে কারো ভুল ধরা অন্যায়। যারা সাহাবায়ে কিরামকে ভালোবাসেন তারাই হকপন্থী। পক্ষান্তরে যারা তাঁদের শানে বেআদবী করে তারা সবাই খারেজী, জাবারিয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ ইত্যাদি ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সত্যের মাপকাঠি হলেন সাহাবায়ে কিরাম। তাঁরা ছাড়া আর কে সত্যের মাপকাঠি হবে? নিজের পিতার সমালোচনা কেউ শুনতে পারে না। যদিও পিতা ফাসেক বা ফাজেরই হোক না

কেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের শানে সমালোচনা ও কটূক্তিকে মুসলমানরা কিভাবে সহ্য করতে পারে?

তাঁরাই দ্বীনে ইসলামের প্রথম বর্ণনাকারী। আজ চৌদ্দশ বছর পর আমরা তাঁদের ব্যাপারে ফয়সালা করতে বসেছি। যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন : "তাঁদেরকে দেখে তোমরা হক্ব বাতিলের মধ্যে ফয়সালা করো।"

পরবর্তী যুগের মানুষ তাঁদের ব্যাপারে ফয়সালাকারী হওয়া সত্যিই একটা হাস্যকর ব্যাপার।

আপনারা ছাহেবযাদা, মাখদূমযাদা প্রমুখদের সম্মান করেন নিসবতের কারণে। যদিও তারা ফাসেকই হোক না কেন। তাহলে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কি এটার উপযুক্ত নন যে, 'নিসবত' তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাঁদের সম্মান করা হবে?

হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ.কে একবার মুরাদাবাদের লোকজন থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করে। আমীরগণ আসলেন। সূফী হযরতদের এক জামাআত আসলেন। তাঁকে রাখার জন্য। তিনি রাযী হলেন না। জনৈক ব্যক্তি বললেন : একটি কৌশল আছে। সরকারী দপ্তরে একজন যুবক আছে। চাকুরী করে। সে বললে হযরত অবস্থান করা মঞ্জুর করবেন। তাকে আনা হল। ঐ যুবক আসা মাত্রই হযরত নানূতভী রহ. তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। সে হযরতকে থাকার জন্য অনুরোধ করলে হযরত সম্মত হলেন। একদিন দুইদিন তিনদিন। সফরের নামও নেন না! লোকেরা বলল : এই যুবকের বৈশিষ্ট্য কি? জানা গেল যে, সে হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ.-এর নাতিদের মধ্যে একজন। নিসবতের কারণে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এই আচরণ করেছেন। যেহেতু তিনি হযরত নানূতবী রহ.-এর দাদাপীর ছিলেন। [হযরত নানূতভীর শাইখ হলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. আর তাঁর শাইখ হলেন হযরত মিয়াজী রহ.। –অনুবাদক]

হযরত নানূতভী রহ. উস্তাদদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকেও সম্মান করতেন। একমাত্র দুর্ভাগা ও পোড়াকপাল মানুষই বেআদবী করে।

হযরত নানূতভী রহ. এরই আরেকটি ঘটনা। তিনি দেওবন্দে ওয়ায করছিলেন। একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে মুসাফাহা করলেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কে? তিনি বললেন : আমি আতর বিক্রেতা, থানাভবন থেকে এসেছি। থানাভবনের নাম শোনা মাত্রই তিনি স্টেজ থেকে নিচে নেমে যান যে, এ ব্যক্তি আমার শাইখ (হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.)-এর এলাকার মানুষ।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি. হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহানী সন্তান। তাঁদের শানে যে কটুক্তি করবে, তার চেয়ে বেশি বদবখত (হতভাগা) আর কে হতে পারে? তাঁদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১০০)

এজন্য তাঁদের নামের সাথে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বলা হয়। এটা পবিত্র কুরআন থেকে নেয়া।

৭. তিন মারকায

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : মুসলমানদের মারকায তিনটি। যতদিন পর্যন্ত এ তিনটির উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, মুসলমানরা উন্নতি করবে। কিন্তু যদি একটি মারকাযও মুসলমানদের হাত থেকে ছুটে যায়, তাহলে মুসলমানদের অতঃপতন আরম্ভ হয়ে যাবে। মুসলমানদের শৌর্য বীর্য খতম হয়ে যাবে। ঐ মারকায তিনটি এই : (১) ইবাদতের মারকায হল হিজায। ইবাদতের জন্য নিরাপত্তা জরুরী। এজন্য হিজাযকে নিরাপদ স্থান বানানো হয়েছে। (২) যুদ্ধের মারকায হল শাম বা সিরিয়া। সিরিয়া ইবাদতেরও স্থান। যুদ্ধেরও স্থান। (৩) সৈন্যবাহিনীর মারকায হল মিসর।

৮. আমল, হাল এবং মাকাম

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : আমল হল শরীয়তের অনুসরণ। শরীয়তের অনুসরণ করতে করতে আমল হাল হয়ে যায়। হাল বা অবস্থা এক সময় দূর হয়ে যায়। যখন সেটা বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন মাকাম বনে যায়। ছাহেবে মাকামের প্রশান্তিদায়ক নফস নসীব হয়। মনমানসিকতার গতিবিধি অনুযায়ী মাকাম গঠিত হয়।

আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. ছিলেন সর্বগুণের আধার। কিন্তু একেকজনের উপর একেক গুণের প্রাধান্য থাকে। হযরত আইয়ূব আ.-এর উপর সবর বা ধৈর্যের মাকাম প্রবল ছিল। হযরত ইয়াকূব আ.-এর উপর বিষন্নতা প্রবল ছিল। বিষণ্নতা বলতে আখেরাতের বিষণ্নতা বুঝানো উদ্দেশ্য। দুনিয়ার পেরেশানী উদ্দেশ্য নয়।

হযরত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মাকামের সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি শুধু 'ছাবের' বা ধৈর্যশীল ছিলেন না বরং 'সায়্যিদুস ছাবেরীন' বা ধৈর্যশীলদের সম্রাট ছিলেন। শুধু 'শাকির' বা কৃতজ্ঞ নয় বরং 'সায়্যিদুশ শাকিরীন' ছিলেন। তিনি 'দায়িমুল ফিকর', 'মুতাওয়াসিলুল আহযান' তথা সার্বক্ষণিক চিন্তাক্লিষ্ট, সর্বদা বিষণ্ন ছিলেন।

প্রতিটি মাকামের শেষ পর্যায় তাঁর পবিত্র কলবে ওয়ারিদ হত। তিনি খাতিমুল মাকামাত এবং খাতিমুল আম্বিয়া ছিলেন।

বর্ণনায় এসেছে :

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

"আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায়।"

قال الحافظ ابن حجر و الزركشي : لا أصل له. كذا في المقاصد الحسنة للسخاوى صفحہ ٣٣٢ رقم الحديث ٧٠٠

অদ্ভূত মিল। আম্বিয়ায়ে কিরামের সংখ্যাও এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যাও এটাই। প্রত্যেক সাহাবীর উপর ভিন্ন ভিন্ন মাকামের প্রাধান্য ছিল।

হযরত আবূ যর গিফারী রাযি.-এর উপর একাকীত্বের প্রাধান্য ছিল। হযরত উমর রাযি.-এর মধ্যে 'নিসবতে মূসাভী' (হযরত মূসা আ.-এর সম্পর্ক) প্রবল ছিল। এমনিভাবে একেকজন সাহাবীর উপর একেক মাকামের প্রাবল্য ছিল। আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যেও একই অবস্থা।

হযরত কাসেম নানূতভী রহ. সব সময় একজোড়া কাপড় পরিধান করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ জোড়া পুরানো না হত এবং ফেটে না যেত, দ্বিতীয় জোড়া বানাতেন না।

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর উপর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাধান্য ছিল। হযরত মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর শান ছিল শাহানা বা রাজকীয়। হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ.-এর উপর 'যুহদ' বা দুনিয়ার প্রতি অনীহাভাবের প্রাবল্য ছিল। তাঁর এখানে প্রচুর মেহমান থাকত। টুংক এর নবাব তাঁর নিকট বাইআত ছিলেন। তিনি পুরো একটি জেলা শাইখের নামে লিখে দিলেন। পিতলের টুকরার উপর লিখে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ.-এর উপর উত্তর লিখলেন :

ماآبروئے فقر وقناعت نمی بریم + بامیر خان گوکہ روزی مقدر است

অর্থাৎ, আমরা দারিদ্র ও অল্পে তুষ্টির সম্মানকে নষ্ট করি না। আমীর খানকে বলে দাও যে, রূযী পূর্ব নির্ধারিত।

হযরত ঈসা আ.-এর জীবন ধারণের সামান ছিল মাত্র দুটি জিনিস। একটি চামড়ার বালিশ, আরেকটি কাঠের পেয়ালা। একবার জঙ্গলের মধ্যে বালিশ ছাড়া একজনকে ঘুমাতে দেখে বালিশ দূরে নিক্ষেপ করেন। আরেকজনকে দেখলেন যে, পেয়ালা ছাড়া হাতের সাহায্যে পানি পান করছে, ফলে পেয়ালাও ফেলে দিলেন।

হযরত সুলাইমান আ. বাদশাহ ছিলেন। আর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজত্ব ও দারিদ্র উভয়টির সমন্বয়কারী ছিলেন।

৯. নামের ব্যাপারে কৌতুক

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনার নাম কি? তিনি উত্তরে বললেন : আমার নাম "রাসূল খান"। অন্য একজন বললেন : আমার নাম "খোদা রাসূল খান"। আমি তার নাম রেখেছি "ফেদা রাসূল খান"।

এক ব্যক্তি নিজের নাম বলল :

أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

অন্যজন বললেন :

مَرْحَبًا يَا أَبَا نِصْفِ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ "ধন্যবাদ হে অর্ধেক কুরআনের পিতা"।

১০. চাঁদে পৌঁছা

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : আমাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন : চাঁদে যাওয়াটা কেমন? আমি বললাম, এটা সাহস কম হওয়ার লক্ষণ। যিনি পৌঁছার তিনি বহু পূর্বে পৌঁছে গেছেন।

আমাদের পিতা হযরত আদম আ. এ পথেই অবতরণ করেছেন। হযরত ঈসা আ. চতুর্থ আসমানে গিয়েছেন। আর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশ ও কুরসী পর্যন্ত পৌঁছেছেন।

আসমানের নিচ পর্যন্ত যেতে পারে। এই পর্যন্ত আমাদের চত্বর। আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত আসমান ভেদ করে চলে যাওয়া অসম্ভব। সেটা পবিত্র সাম্রাজ্য। সেখানে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব আছে। নিষ্পাপ জগতে নফসের অন্ধকার নিয়ে কিভাবে যাবে?

ইরশাদ হচ্ছে :

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾

অর্থাৎ, "হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি তোমাদের এই ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা হতে কোথাও বের হয়ে যেতে পারো, তবে বের হয়ে যাও। কিন্তু সামার্থ্য ব্যতীত বের হতে পারবে না"।

(সূরা রহমান, আয়াত ৩৩)

বাহ্যিক উপকরণের সাহায্যে আসমান ভেদ করে যাওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বাতেনী উপকরণের ব্যবস্থা করে না দেন।

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গমন করলেন এবং আসমানের দরওয়াযাসমূহের নিকট পৌঁছলেন, তখন ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেছেন, পরবর্তীতে অনুমতি দিয়েছেন। এটাই সেই سُلْطٰن বা 'সামর্থ্য' যার কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে পাসপোর্ট, ভিসা, অতঃপর টিকা, ইঞ্জেকশন লাগানো হয়।

আসমানসমূহ ভেদ করার জন্য যেখানে সায়্যিদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভিসা তথা মহান আল্লাহর অনুমতি, পাসপোর্ট তথা ঈমানী শক্তি, ইঞ্জেকশন-টিকা বা বক্ষবিদারণের পাবন্দী, সেখানে কাফেররা কি এমনিতেই পার হয়ে যাবে?

তারকারাজীর সমস্ত ব্যবস্থাপনা আসমানের নিচে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সব তারাগুলো নূরানী শিকলে লটকে আছে। কিয়ামতের দিন যখন ঐ শিকল আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে যাবে, তখন সমস্ত তারা পড়ে যাবে।

যারা ফেরেশতা বিশ্বাস করে না, তারা বলে যে, এ সব মধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু আকর্ষণ তো হল একটি গুণ। সেটা কোন্ সত্তা যার মধ্যে এই আকর্ষণ বিদ্যমান? যে কোন গুণকে সত্তা থেকে পৃথক করে দেখানো যায় না।

এরা মধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বলে। অথচ ফেরেশতাদের ব্যাপারে ভুলের মধ্যে আছে।

১১. ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ইয়াহুদীরা ছিল ইলমী উম্মাত। যখন তারা বিগড়ে গেল, তখন ইলমী ফিতনা সৃষ্টি হল। খ্রীস্টানরা

ছিল আমলী উম্মাত। ইঞ্জীল হল তাসাওউফের কিতাব। এরা যখন বিগড়ে গেল, তখন আমলী ফিতনা সৃষ্টি হল।

১২. ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় দুআ

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : যে কোন স্থাপনার সূচনা মুহূর্তে এ আয়াতগুলো পাঠ করবে :

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

অর্থাৎ, "আর যখন ইবরাহীম নির্মাণ করছিলেন কাবাগৃহের প্রাচীর এবং ইসমাঈলও। তারা বললেন : হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হতে কবূল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রভু! আর আমাদেরকে আপনি আপনার আরো অধিক অনুগত বানিয়ে নিন। আর আমাদের বংশধর হতেও আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন। আর আমাদেরকে আমাদের হজ্জের আহকামও বলে দিন এবং আমাদের অবস্থার প্রতি (কৃপা) দৃষ্টি রাখুন। আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই তাওবা কবূলকারী অতিশয় দয়ালু।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত ১২৭-১২৮)

আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করে পাঠ করবে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ دَارِنَا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ঘরে বরকত দান করুন।"

মসজিদ-মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-এর সময় উল্লেখিত দুটো আয়াত পাঠ করে এ আয়াতটি পাঠ করবে,

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই ঐ মসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাক্বওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে সেটা এর উপযোগী যে, আপনি তাতে নামাযের জন্য দাঁড়াবেন। এতে এমন সব লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পসন্দ করে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পসন্দ করেন"।
(সূরা তাওবা, আয়াত ১০৮)

১৩. দারুল উলূম দেওবন্দ আলোর মিনার হয়ে গেছে

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন 'উস্তাযুল কুল' বা সর্ববিষয়ে শিক্ষক। তিনি সুফফা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মসজিদে নববীতে একটি চত্বরের মত বানানো আছে। সেটা মাদরাসা ছিল। তার তালিবে ইলম ছিলেন হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. এবং অন্যান্য আসহাবে সুফফা। মাদরাসা হল 'সুফফাতুল ইসলাম'। উস্তায ছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যখন হযরত আলী রাযি.-এর যুগে খেলাফত কূফায় স্থানান্তরিত হয়, তখন ইরাকে বড় বড় ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। এরপর খোরাসান ও ইরান ইলমের মারকায হয়। অতঃপর হেরাত, বলখ ও বুখারা ইলমের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখান থেকে মারকায হিন্দুস্তানে স্থানান্তরিত হয়। দিল্লী হল মারকায। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাফসীর ও হাদীসের ইলম ছড়িয়ে দিয়েছেন। আকল ও নকলের সমন্বয়ে শরীয়তকে বুঝিয়েছেন। যাতে আকল বা যুক্তি প্রেমিকের অস্বীকার করার অবকাশ না থাকে। এই নমূনাকে তিনি উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। হাজারো মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

পরবর্তী সময়ে যখন ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ইলমের মারকায বা কেন্দ্র দেওবন্দে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। দেওবন্দ থেকে অর্ধ লক্ষাধিক আলেম পয়দা হয়েছেন। দেওবন্দ থেকে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বের হয়েছেন। যাঁর রচনাবলীর সংখ্যাই প্রায় এক হাজার। প্রায় পঞ্চাশ বছর খানকাহে ইমদাদিয়াতে কাটিয়েছেন। এই দেওবন্দ থেকেই হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বের হয়েছেন। যাঁকে চলন্ত কুতুবখানা বলা হত। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তৈরী হয়েছেন। যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ ছাহেব, মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ., মাওলানা ইদরীস ছাহেব কান্ধলভী রহ.-এর ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন মনীষী জন্ম লাভ করেছেন। তাঁরা ইলমের প্রচার-প্রসার করেছেন। হাজার হাজার আলেম তাঁদের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

একবার আমি বার্মা গিয়েছিলাম। তো 'আকিয়াব' শহরে প্রায় আড়াইশত দেওবন্দের ফাযেল একত্রিত হয়েছিলেন। এই দেওবন্দ মারকায থেকেই নানা শাখা প্রশাখা সিলেট আসাম ও বার্মায় ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক দিন পূর্বে আমি লন্ডন গিয়েছিলাম। তো দেখলাম যে, সেখানেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

এভাবে দারুল উলূম দেওবন্দ আলোর একটি মিনার হয়ে গেছে। চতুর্দিকে এর আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

১৪. হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ.-এর ব্যাপারে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মালফূয

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ ছাহেব রহ. যখন থানাভবনে যেতেন, তখন হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলতেন, "তার বোঝা অনুভব করি"। এটা হল ইলমের বোঝা। তিনি চলন্ত কুতুবখানা ছিলেন। কেমন যেন সব কিতাব তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।

১৫. ইলম ও সম্পদ

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : যাঁদের নিকট ইলমের সম্পদ আছে, তাঁদের অন্য কোন সম্পদের কী প্রয়োজন? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর যখন কোন মাসআলা বুঝে আসত, তখন আনন্দের আতিশয্যে নাচতে থাকতেন এবং বলতেন :

أَيْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ مِنْ هٰذِهِ اللَّذَّاتِ؟

"কোথায় দুনিয়ার রাজা বাদশাহগণ? এই নেয়ামত ও স্বাদ তারা পাবে কোথায়"?

তালিবানে ইলম ও উলামায়ে কিরাম যদিও বাহ্যিকভাবে মিসকীন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁরাই রাজা।

মানুষ হল কলবের নাম। যার কলব বা অন্তর আলোকিত, সেই হল প্রকৃত মানুষ। পক্ষান্তরে কলব যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তাহলে পোশাক-পরিচ্ছদ যতই উন্নত হোক না কেন এর দৃষ্টান্ত ঠিক এরকম, যেমন নাপাকীর উপর স্বর্ণের তালি লাগানো হল। তাহলে ঐ তালিও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। সম্পদ কোন স্থায়ী বস্তু নয়। রাজা ফকীর হয়, ফকীর রাজা হয়। ইলম সব সময় কায়েম থাকে। এটা হল চিরস্থায়ী সম্পদ। চিরন্তন। ইলমকে সম্পদ আহরণের মাধ্যম বানানোর উপমা হল পশমী চাদর দিয়ে জুতা সাফ করা। ইলম কবরে যাবে। হাশরে যাবে। জান্নাতে যাবে। কিন্তু সম্পদ সঙ্গে যাবে না। সম্পদ খরচ করলে কমে যায়। কিন্তু ইলম খরচ করলে আরো বৃদ্ধি পায়। এ জন্যই যত পুরানো উস্তায হবে, ততই মযবূত হবে। ইলম খরচ করলে যদি কমে যেত, তাহলে পুরানো উস্তায মূর্খ থেকে যেত।

সম্পদের হেফাযত করতে হয়। পক্ষান্তরে ইলম নিজে আলেমের হেফাযত করে। পুলসিরাতে সম্পদ পথ আগলে দাঁড়াবে। কিন্তু ইলম পথপ্রদর্শন

করবে। পুলসিরাতের দূরত্ব হল পনের হাজার বছর। সম্পদ হল বস্তুর গুণ। আর ইলম হল মহান আল্লাহর গুণ। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু ধ্বংসশীল। আল্লাহ পাকের সবকিছু চিরন্তন। ইলমে ওয়াহীর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসা হল প্রকৃত মানুষ তৈরীর কারখানা। মানুষ হল আদর্শের নাম। আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় ইলম এবং আখলাক দ্বারা।

এই পুরো জগৎ মাদরাসা। যার মধ্যে আমরা সকলেই তালিবে ইলম হিসেবে অবস্থান করছি। তালীম বা শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.কে মুদাররিস তথা শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে :

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

"আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথপ্রদর্শক।"

(সূরা রা'দ, আয়াত ৭)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ

"আর প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রয়েছে রাসূল"। (সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৭)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

"আর আমি অতক্ষণ পর্যন্ত আযাব দেইনা যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল প্রেরণ না করি।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫)

আম্বিয়ায়ে কিরাম পুরো জগতের শিক্ষক। প্রথমে হযরত আদম আ. অতঃপর হযরত নূহ আ. এরপর হযরত ইবরাহীম আ. এসেছেন।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ

"অতঃপর আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি একের পর এক।"

(সূরা মুমিনূন, আয়াত ৪৪)

অতঃপর প্রয়োজন ছিল প্রধান শিক্ষকের। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সমস্ত নেয়ামত পরিপূর্ণতায় পৌঁছল।

ইরশাদ হচ্ছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৩)

পরীক্ষাও হবে। ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক। বার্ষিক। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কবরে–হাশরে পরীক্ষা নেয়া হবে। জান্নাত হল চিরস্থায়ী নেয়ামত। জাহান্নাম হল চিরস্থায়ী আযাব। আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ.) মীরাছ বা ত্যাজ্য সম্পদ হল ইলম। আমাদের কাজ হল ইলম হাসিল করা। ইবাদতে লেগে থাকা। রিযক দেয়া আল্লাহর কাজ। এই গুঢ়তত্ত্ব যে বুঝেনি সে ফেল। আযাবের জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত।

১৬. হযরত কাসেম নানূতভী রহ.

ঘটনা নং– ১ : হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : বাসর রাতে আমার সম্মানিত দাদা হযরত কাসেম নানূতভী রহ. স্বীয় স্ত্রীকে বললেন : "আমার জন্য নির্দেশ হল স্নেহের আর তোমার জন্য নির্দেশ হল আনুগত্যের। তো আমার আনুগত্য কি তুমি মঞ্জুর করেছ"? স্ত্রী লজ্জা পেলেন আর কোন উত্তর দিলেন না। হযরত নানূতভী রহ. বললেন : "যদি এই শরম প্রকৃত শরম হয়ে থাকে, তাহলে জীবনভর এটাকে বহাল রেখ এবং কিছু বলো না। আর যদি এই শরম বানোয়াট হয়, তাহলে উত্তম হল এখনই এই শরম ভেঙ্গে দেয়া।" স্ত্রী বললেন : "আমি আনুগত্য গ্রহণ করলাম।" অতঃপর হযরত নানূতবী রহ. বললেন : "বিবাহের সময় উপহার হিসেবে যত "জাহীয" (এর অর্থ যৌতুক নয় বরং বিবাহের সময় পিতা কর্তৃক কন্যাকে প্রদত্ত হাদিয়া) পেয়েছ, সব আমার নিকট হস্তান্তর কর"। স্ত্রী হস্তান্তর করে দিলেন। ফলশ্রুতিতে হযরত নানূতভী রহ. তদানীন্তন সময়ের বিশ বাইশ হাজার টাকা মূল্যের সমস্ত কাপড় রোম যুদ্ধের জন্য চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিলেন। হযরতের শ্বশুর সাহেব পুনরায় কাপড়ের সেট বানিয়ে দিলে তিনি সেটাকেও চাঁদায় দিয়ে দিলেন।

ঘটনা নং– ২ : জনৈক থানাদার হযরত নানূতভী রহ.কে দাওয়াত করলেন। হযরত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন যে, আমার ওযর আছে। ঐ লোক বললেন : আমি গাড়ী নিয়ে আসছি। এটার উপরও হযরত অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন : ঠিক আছে আমি পয়সা পাঠিয়ে দিব। হযরত ওযরখাহী করলেন।

এক পর্যায়ে ঐ থানাদার গোস্বা হয়ে হযরতকে গালমন্দ করলেন এবং বললেন যে, দাওয়াত কবূল করা সুন্নাত।

ঐ লোকের সমস্ত ভরসা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন হযরত নানূতভী রহ. বললেন : "এ মুহূর্তে আমার এত এত ত্রুটি আপনার সামনে প্রকাশ পেল। যদি সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাহলে তো আপনি আমার থেকে দূরেই সরে পড়বেন।"

ঐ ব্যক্তি বললেন : আমার আম্মার একটি জমি আছে। সেখান থেকে আপনাকে খাওয়াব। হযরত কবূল করে নিলেন।

১৭. আমলের পেনশন

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : সরকার পেনশন দেয় এক তৃতীয়াংশ। আর আল্লাহ তাআলা পূর্ণ পেনশন দান করেন। বার্ধক্যের কারণে যদি আমল করতে না পারে তাহলে পূর্ণ সাওয়াব দান করেন।

মাদরাসা, সরাইখানা, কূপ ইত্যাদির সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে।

১৮. ঈমানের হাকীকত হল মহব্বত

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : মহব্বতই বাস্তবিকপক্ষে ঐ জিনিস, যা বান্দাগণকে আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিয়ে দেয়। আম্বিয়া আ.-এর আগমনের উদ্দেশ্য হল এই মহব্বত সৃষ্টি করা। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-সন্তান এবং সমস্ত মানুষ থেকে বেশী প্রিয় না হব"। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের হাকীকত বা বাস্তবতাই হল মহব্বত। সব থেকে বেশি মহব্বত মুমিন ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার সাথেই। ইরশাদ হচ্ছে :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ

"আর ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বপেক্ষা বেশি ভালবাসে"। (সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৬৫)

তাঁরা আল্লাহর মহব্বতে বিভোর। ডুবে থাকে। এরপর হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত। এরপর হল সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) মহব্বত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ .

"আর যে ব্যক্তি তাদেরকে (সাহাবায়ে কিরাম) ভালবাসল সে আমার ভালবাসার কারণেই তাদেরকে ভালবাসল। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল"।

(মুসনাদে আহমাদ ও জামে তিরমিযী)

এরপরের নম্বর হল মুসলমানদের পরস্পরের মহব্বত। যখন ঈমান শক্তিশালী হবে, তখন মুসলমানদের পরস্পরের মহব্বত শক্তিশালী হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই।"

(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০)

ভাইয়ের সাথে মহব্বত হয়। শত্রুতা হয় না। নতুবা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকবে না।

মানুষকে মহব্বতওয়ালা হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইনসান أُنْسٌ তথা মহব্বত থেকে উদ্ভূত। প্রাণীদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা থাকে। এ জন্য তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে বসবাস করে। মানুষ বসতি তৈরী করে। শহর আবাদ করে। এক সাথে থাকে। (কারণ মানুষ সামাজিক জীব)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثَةٍ

অর্থাৎ "কেউ যেন তার অপর (মুসলমান) ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় না থাকে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসে পাকের মর্ম হল এই যে, তিন দিনের পরও যদি শত্রুতা থাকে, তাহলে ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা চলে আসবে। মহব্বত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। সম্পদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হবে না। মুসলমানদের পরস্পরের মহব্বত তাদের ঈমানকে দৃঢ় করে। আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এ মহব্বতের কারণেই মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যখন আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যায়, তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। মহব্বতের দ্বারা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে কয়েকজন মুজাহিদ যখম ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছটফট করছিলেন, প্রাণ বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত ছিল। একজন পানির জন্য ইশারা করলেন। পানি আনা হলে নিজের পার্শ্বে ছটফট করতে থাকা মুজাহিদের দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, তাঁকে পূর্বে পান করাও। আমি পরে পান করব। এভাবে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় রূহ বের হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের দ্বীনী ভাইয়ের মহব্বত ছাড়েননি।

মুসলমানদের জন্য বুনিয়াদী জিনিস হল ভ্রাতৃত্ব, মহব্বত, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান ও পারস্পরিক সহমর্মিতা। এগুলোই একতার মূল। এর দ্বারাই বড় বড় শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেছে। পারস্য ও রোমের মত সুপার পাওয়ার তাদের সামনে মস্তক অবনত করেছে।

মুসলমানরা পরস্পর মিলেমিশে থাকলে বিজয়ী হবেই। নতুবা বড় বড় কুফরীশক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

تَدَاعَى الْأَكَلَةِ عَلَى الْقَصْعَةِ

আহারকারীদের একে অন্যকে খানার প্লেটে ডাকার মত কুফরীশক্তিগুলো পরস্পর একে অপরকে ডাকবে। কেউ বলবে : মুসলমানদের সম্ভ্রম নষ্ট করো। কেউ চাইবে তাদের সম্পদ নষ্ট করতে। কেউ চাইবে তাদের ভূমি দখল করতে। কেউ বলবে তাদের হুকুমত দখল করো।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি. জিজ্ঞেস করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তখন সংখ্যায় কম হব? প্রতিউত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ

"সংখ্যায় কম হবে না, কিন্তু তোমরা তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যাবে। দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যুভীতি তোমাদের দুর্বলতার উপলক্ষ হবে"।

(মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ)

দুনিয়াপ্রীতির দরুন ঈমানে দুর্বলতা চলে আসে। পক্ষান্তরে আখেরাতের মহব্বতের কারণে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়। রাবারের তৈরী ফুটবলে বাতাস ভরে সেটাকে মাটিতে নিক্ষেপ করলে দশ গজ উপরে উঠে যাবে। বাতাস তাকে উপরে উঠিয়ে নিবে। যদি মুসলমানদের মধ্যে কুরআনে কারীম এবং ঈমানের বাতাস ভরা থাকে, তাহলে তারা কখনো পরাজিত হবে না।

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا

"আর এভাবেই আমি আপনার নিকট আমার পক্ষ থেকে আদেশ তথা ওয়াহী প্রেরণ করেছি।" (সূরা শূরা, আয়াত ৫২)

বর্তমানে মুসলমানরা ঐ রূহ বের করে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে কাফেররা মুসলমানদেরকে নিয়ে যা মনে চায় তা-ই করছে। যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করছে। যাকে মন চায় অপদস্থ করছে।

'ঐক্য' যদি দ্বীনের জন্য হয় তাহলে ভাল। স্বার্থের জন্য হলে খারাপ। মুসলমানদের ঐক্যের ফলে ইসলামের শত্রুরা প্রভাবিত হবে। আমরা

তাদেরকে সম্পদ দিয়ে প্রভাবিত করতে পারব না। কেননা তাদের নিকট সম্পদ বেশি। প্রাসাদের দ্বারাও নয়। কেননা তাদের নিকট প্রাসাদও বেশি। বরং আমরা আখলাকে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও রূহানী শক্তি দ্বারা বিজয় লাভ করব।

এই ঈমানীশক্তির দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম রাযি. পাহাড় টলিয়ে দিতেন। উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেন।

১৯. বাইআতের উপকারিতা

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : বাইআতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নফসের ইসলাহ বা সংশোধন। মানুষের সাথে জন্মগতভাবে চারিত্রিক ব্যাধিসমূহ লেগে আছে। যেমন : বিদ্বেষ, অহংকার, হিংসা-পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

বাইআতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল মন্দ স্বভাবগুলো দূর করা এবং উত্তম স্বভাবগুলো সৃষ্টি করা। যখন উত্তম স্বভাব সৃষ্টি হবে, তখন শরীয়তের অনুসরণ সহজ হবে।

আখলাক ও নফসের সংশোধনের ভিত্তি হল অধিক যিকিরের উপর। উদাসীনতা যতটুকু বাড়ে, অন্ধকার ততটুকুই বাড়ে। অন্ধকারের কারণে গুনাহের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। অধিক যিকিরের ফলে পবিত্র আখলাক সৃষ্টি হয়।

ইরশাদে রব্বানী :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো।"

(সূরা আহযাব, আয়াত ৪১)

আসল যিকির হল, ফারায়েয, ওয়াজিবাত, মুস্তাহাব, সুন্নাত ইত্যাদি শরয়ী আমলসমূহ। অধিক যিকির : এক তো হল সকাল-সন্ধ্যার যিকির। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুআ পাঠ করা। মসজিদে প্রবেশ করার দুআ, বের হওয়ার দুআ, খানা খাওয়ার দুআ, ঘুমানোর সময় দুআ।

এই যে বিভিন্ন সময়ের দুআ, যেগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, উলামায়ে কিরাম সেগুলোকে জমা করে দিয়েছেন।

নিজের যবানের বেশি হেফাযত করুন। অধিকাংশ ফেতনা যবানের দ্বারাই সংঘটিত হয়। যখন কথা বলবেন, চিন্তা ভাবনা করে বলবেন। যবান নিয়ন্ত্রণে থাকলে জীবন পবিত্র হয়ে যায়।

সব সময় কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলুন। দুআও করতে থাকুন। দুআ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। স্বতন্ত্র যিকির। হাযারাতে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. যতটুকু উন্নতি হয়েছে, সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বরকতেই হয়েছে।

২০. দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশ হাদীসের মধ্যে

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের মধ্যে আছে। দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন হাদীসের মধ্যে আছে। হাদীস না থাকলে ঐ এক তৃতীয়াংশও আমাদের মনগড়া মতের শিকারে পরিণত হবে।

২১. কবর যিয়ারতের সময় হাত উঠানো

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : যে ব্যক্তির উপর ফতওয়া নির্ভরশীল, যিনি অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, কবর যিয়ারতের সময় তাঁর হাত তোলা অনুচিত। নতুবা সাধারণ মানুষ মনে করবে যে, তিনি সেখান থেকে কিছু প্রার্থনা করছেন।

২২. জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : একটি জাতির সুস্থতা ও উন্নতি সংখ্যার আধিক্যের দ্বারাও হয় না। সম্পদের দ্বারাও হয় না। বরং জাতি সভ্য হয় কর্মকাণ্ড দ্বারা, আখলাক দ্বারা। আমরা ইসলামের শত্রুদেরকে সম্পদ দ্বারা প্রভাবিত করতে পারব না। কেননা তাদের নিকট আমাদের চেয়ে বেশি সম্পদ আছে। আর অধিক বিল্ডিং বা প্রাসাদ দ্বারাও প্রভাবিত করতে পারব না। কেননা এগুলোও তাদের কাছে বেশি। আমরা তাদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারি একমাত্র 'আখলাকে মুহাম্মাদী' ও 'কুওয়াতে রূহানী' দ্বারা।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এই ঈমানী শক্তির বলেই পাহাড়ের সাথে টক্কর দিতেন। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

আরবে মক্কার কাফেরদের মধ্যে পরস্পর লড়াই হত। মৃত্যুপথযাত্রী লড়াই অব্যাহত রাখার অসিয়্যত করে যেত। ইসলাম সকলকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে ও নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে দাওয়াত দিয়েছে। তাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেল। মক্কার কাফেরদের উপাধি হল 'সাহাবায়ে কিরাম' রাযি.। 'শাররুল কুরূন' হল 'খাইরুল কুরূন' তথা সর্বনিকৃষ্ট যুগ পরিণত হল সর্ব উৎকৃষ্ট যুগে।

সিরিয়ার একটি এলাকায় মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। খ্রীস্টানদের থেকে 'জিযিয়া' (মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের থেকে আদায়কৃত কর ও ট্যাক্স) নেয়া হল। তদানীন্তন খলীফা নির্দেশ দিলেন মুসলমানদেরকে অন্যত্র সরে যাওয়ার জন্য। মুসলিম গভর্ণর পাদ্রীদেরকে বললেন : "জিযিয়ার যে টাকা আমরা আপনাদের থেকে উসূল করেছিলাম, সেগুলো ফেরত নিন। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এসব টাকা পয়সা তো আপনাদের হেফাযতের জন্য নেয়া হয়েছিল।"

পাদ্রীরা বলল : "আমরা এই টাকা ফেরত নিব না। আমরা আপনাদের অধীনেই থাকতে চাই"।

আমরা সেই সে জাতি।

আমাদের পূর্বসুরীদের উন্নতি তরবারীর জোরে হয়নি। বরং আখলাক ও স্বভাবের দ্বারাই হয়েছে।

যখন বাগদাদে খেলাফতের চরম উৎকর্ষের যুগ ছিল, ইউরোপে মুসলমানদের বিস্ময়কর উত্থানের নেপথ্য কারণ জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করা হল। এবং তাদেরকে বাগদাদ প্রেরণ করা হল। প্রতিনিধিদল বাগদাদে এসে অবস্থান করল। সরাইখানায় উঠল আর খোঁজ-খবর নিতে থাকল। সরকারী প্রতিনিধিদল ছিল। সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ কড়ি ছিল। বাজারে গিয়ে হাজার হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করলেন। দোকানদারকে বললেন : বিল বানানোর জন্য। তো দোকানদার বললেন : "আপনারা মেহমান মানুষ। মেহমান থেকে মূল্য নেয়ার কী অর্থ? যে সব পণ্য নিয়েছেন, তার সমপরিমাণ আরো পণ্য নিন। বিল বানানোর প্রয়োজন নেই।"

প্রতিনিধি দল হতভম্ব হয়ে গেছে। তারা বাজারে গিয়ে দেখল যে, একজন ব্যবসায়ী দিনের প্রথমার্ধে বিক্রি করে। এরপর শেষ অর্ধে অন্য একজন বিক্রি করে। প্রথম ব্যবসায়ী দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর দোকানের দিকে গ্রাহকদেরকে পথপ্রদর্শন করে। যাতে উভয়ে লাভবান হতে পারে।

প্রতিনিধিদল বিদায় নেয়ার সময় সরাইখানার বিল দিতে চাইলে সরাইখানা কর্তৃপক্ষ বলল যে, মেহমান থেকে তো বিল নেয়ার প্রশ্নই আসে না।

ফলশ্রুতিতে প্রতিনিধিদল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই জাতি কীর্তি, চরিত্র, দিয়ানতদারী বা সততা এবং লেনদেনের স্বচ্ছতার দরুন অগ্রসর হচ্ছে।

ব্যবসার সূত্রে চীনে কিছু মুসলমান পৌঁছলেন। তাদের ব্যবসা যখন ফুলে ফেঁপে উঠল, তখন চাইনিজদের মধ্যে হিংসা সৃষ্টি হল। তারা সরকারকে পরামর্শ দিল যে, এসব বহিরাগতদেরকে বের করে দেয়া হোক। সরকার

তাদেরকে বের হওয়ার জন্য বললে তারা সরকারের নিকট কৈফিয়ত তলব করল যে, আমাদের কী অপরাধ? আমরা সততার মাধ্যমে এ দেশকে আবাদ করেছি। আমাদের ভুলটা কী? বলা হল : ভুলটুল কিছু নয়। বের হয়ে যাও। মুসলমানরা বলল : আমরা এই যুলুমের মুকাবেলা করব।

যখন এ সংবাদ দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ উঠল যে, তাদেরকে বের করে দেয়া হবে কেন? এরা তো ভাল মানুষ। আমাদেরকে আখলাক ও সততা শেখায়। বাদশাহ ঘাবড়ে গেলেন এবং নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

ফলশ্রুতিতে আজ চীনে আট কোটি (বর্তমানে আরো অনেক বেশি। –অনুবাদক) মুসলমান বসবাস করছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে মানুষ আমাদেরকে ঘৃণা করে।

২৩. কথা বেশি আমল কম

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ভারতবর্ষ এবং পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে সূফী হযরতদের মেহনতের ফলেই ইসলাম বেশি প্রসারিত হয়েছে। যেহেতু হিন্দুস্তানে যোগী এবং সন্যাসীদের প্রাধান্য ছিল, এজন্য সূফীয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে এখানে ইসলাম প্রচার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি যোগী অবিশ্বাস্য কোন একটি ঘটনা দেখাত, তাহলে সূফী হযরতগণ দশটি কারামত প্রকাশ করতেন।

এইসব মহান মনীষী যেখানেই গিয়েছেন, নিজ আমল ও আখলাকের মাধ্যমে মানুষদেরকে ভক্ত বানিয়েছেন। এবং পুরো এলাকাকে নিজ রঙে রাঙিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. কূফায় গিয়েছেন তো সেখানে নিজ আসর জমিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. হেজায এবং মিসরে থেকেছেন তো পুরো হেজায এবং মিসর কাঁপিয়ে দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. নজদে অবস্থান করেছেন তো ঐ পুরো এলাকাকে নিজ রঙে রঙ্গীন করেছেন। ইমাম মালেক রহ. মদীনা তায়্যিবায় অবস্থান করেছেন তো পুরো মদীনায় স্বীয় সৌরভ ও দ্যুতি ছড়িয়েছেন। বর্তমানে লোকেরা আমাদের চরিত্রের কারণে আমাদেরকে ঘৃণা করে। হাদীসে পাকে এসেছে :

كَثِيْرٌ خُطَبَائُهُمْ وَقَلِيْلٌ فُقَهَائُهُمْ

"তাদের খতীব বেশি হবে এবং ফকীহ কম হবে।"

(আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক)

২৪. সামা' সঙ্গীত নাজায়েয

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : কারো উপর বিষণ্ণতা প্রবল হলে চিকিৎসা হিসেবে সাময়িকভাবে সামা'র অবকাশ আছে। যতক্ষণ রোগ থাকে, অতক্ষণ চিকিৎসা অব্যাহত থাকে। এমন নয় যে, বারো মাস শুধু ঔষধ সেবন করতে থাকবে।

বর্তমানে সামার নামে সেতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র এবং নর্তকীদের আগমন, বেশ্যাদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ সবকিছুকে বৈধ মনে করে!

যদি এদের কথাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে পানাহার আর গানবাদ্যই ধর্মের সারাংশ হিসেবে থেকে যাবে। এ সব কাজে বাধা দিলে বলে যে, এরা ওহাবী, কাফের। কেমন যেন কুফর ও ইসলামের মানদণ্ড হচ্ছে বেদআতখণ্ডন। বেদআতখণ্ডন করলেই কাফের! অন্যদিকে গান বাজালে আর মদ্যপান করলেও সুন্নী!!

২৫. ওয়াহাবী

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : দেওবন্দী নিজে নজদী ও ওয়াহাবীদের বিরোধী। একটা জিনিস উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে আছে। সেটা হল "বেদআতখণ্ডন"। এ কারণেই ইংরেজরা আলেমদেরকে 'ওয়াহাবী' নাম দেয়।

পেশোয়ার শহরে একজন আলেম জনৈক বেনিয়া (বণিক) থেকে বাকীতে মাল নিত। মাস শেষে বিল আদায় করত। একবার বিল পরিশোধে বিলম্ব হয়ে গেল। আলেম ব্যক্তি বেনিয়াকে বলল যে, টাকা আগামীকাল দিয়ে দিব। আজ সদাই দিয়ে দাও। বেনিয়া সদাই দিতে অস্বীকার করল। এমন প্রেক্ষাপটে ঐ আলেম শহরের মধ্যে একটি ওয়ায মাহফিল করে ঘোষণা দিল যে, "এই বেনিয়া ওয়াহাবী হয়ে গেছে। এর থেকে কেউ সদাই নিবেন না।" ফলে লোকেরা তার থেকে সদাই নেয়া বন্ধ করে দিল। যদ্দরুন শেষপর্যন্ত বেনিয়া তাওবা করল। এভাবে ঐ আলেম নিজ করয মাফ করিয়ে নিল! অতঃপর শহরে ঘোষণা করল যে, বেনিয়া তাওবা করেছে। এখন তার থেকে সদাই নিতে পারো। লোকজন পুনরায় সদাই নেয়া আরম্ভ করল।

২৬. নামাযের পর মুনাজাত

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : পূর্বসুরী বুযুর্গানে দ্বীনের আমল এটাই ছিল যে, তাঁরা ফরয নামাযের পর মুনাজাত করতেন। সলফের

আমল একটি স্বতন্ত্র দলীল। ইমাম মালেক রহ. এটাকে স্বতন্ত্র দলীল আখ্যায়িত করেন।

আসলে হক হল ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায়। বাড়াবাড়িও না করা যে, এটাকে জরুরী মনে করল। আবার ছাড়াছাড়িও না যে, এটাকে বেদআত ঘোষণা দিল!!

২৭. ইলম এবং জাহালাত

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ইলম (জ্ঞান) এবং জাহালাত (মূর্খতা) এর ব্যাপারে হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলতেন : "আমার ইলম সব সময় আমাকে সঙ্গ দেয় না। কখানো সঙ্গ দেয় আবার কখনো সঙ্গ ছেড়ে দেয়। কিন্তু জাহালাত সব সময় সঙ্গ দেয়।"

২৮. একটি কৌতুক

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : একবার খানা সামনে আসলে হযরাতুল আল্লাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বললেন : "চলুন! এখন জান্নাতের কাজ করি। জান্নাতে তো এই পানাহার আর আরাম করাই হবে। নামায পড়া, ওয়ায করা এগুলো তো দুনিয়ার কাজ।"

২৯. আকাবিরে দেওবন্দের নিসবত

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে একটি নিসবত আছে "চিশতিয়্যাহ"। এর প্রতিক্রিয়া হল : জ্বলন-দহন, হা হুতাশ, কান্নাকাটি। আরেকটি নিসবত আছে সুন্নাত অনুসরণের। যেটা হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ এবং হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর নিসবত।

হযরত সায়্যিদ শহীদ রহ. একবার একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : "আমার এখানে নূর ও বরকত নজরে আসছে।"

এই মসজিদে হযরত শাইখ আব্দুর রহীম রহ. থাকতেন। হযরত সায়্যিদ শহীদ রহ. তাঁর হুজরায় গমন করলেন। ভিতরে ঢুকে দরওয়াযা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন বের হলেন, তখন একজনের নিসবত অন্যজনের মধ্যে ক্রিয়া করেছে।

হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর মধ্যে প্রফুল্লতার নিসবত ছিল। আর হযরত শাইখ আব্দুর রহীম রহ.-এর উপর সব সময় 'আত্মবিলোপ' এর অবস্থা প্রবল থাকত। সর্বদা কাঁদতে থাকতেন। এখন যখন বের হলেন, তো হযরত সায়্যিদ শহীদ রহ. কাঁদতে কাঁদতে বের হলেন এবং হযরত শাইখ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ. হাসতে হাসতে বের হলেন।

হযরত সায়্যিদ ছাহেব রহ. যখন হজ্জে গমন করেন, তখন রাস্তায় জাহাজে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের পানি মিষ্টি ছিল না। বুযুর্গদের দিয়ে দু'আ করানো হল। কিছুই হল না।

হযরত সায়্যিদ শহীদ রহ. হযরত ইসমাইল শহীদ রহ.-এর দিকে ইশারা করে বললেন যে, "ইনার মাধ্যমে দু'আ করাও। ইনি দু'আ করলে কাজ হয়ে যাবে।"

তাঁর কাছে আরয করা হল যে, "হযরত! দু'আ করুন। পানি শেষ হয়ে গেছে।" তিনি বললেন যে, দু'আর জন্য একটি শর্ত হল এই যে, সকল হাজীকে আধা সের 'জামালগোটা' খাওয়াতে হবে। শর্ত মঞ্জুর হল। দু'আ আরম্ভ করলেন। সমুদ্রের মধ্যে সাদা গোল বৃত্তের মত দৃশ্যমান হল। ঐ বৃত্ত বাড়তে বাড়তে জাহাজের নিকটে চলে আসল। সেটা মিষ্টি পানি ছিল। বললেন : এর দ্বারা পানি ভরে নাও। সবাই পানি ভরে নিল। তখন ঐ গোল বৃত্ত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর সবার মধ্যে জামালগোটার হালুয়া বণ্টন করা হল।

হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. দেখতে সৈনিকসুলভ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর কলবকে তাঁর শাইখ হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. অনেক উঁচু মাকামে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

একবার মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. হযরত সায়্যিদ ছাহেব রহ.-এর নিকট আরয করলেন যে, হযরত! আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম রাযি.এর ন্যায় নামায পড়িয়ে দিন। হযরত সায়্যিদ ছাহেব রহ. বললেন : ঠিক আছে। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. নিয়্যত বাঁধলেন। তো এক রাকআতে ফজর হয়ে গেল।

এই ছিল সায়্যিদ ছাহেব রহ.-এর তাসাররুফের অবস্থা। এটা সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর নামাযের অনুসরণ ছিল।

সাহাবায়ে কিরামের রাযি. শানে বেআদবী করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যাহের ও বাতেন তথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু সাহাবায়ে কিরাম রাযি. থেকে হয়েছে।

৩০. ইসলাম ও বর্তমান সভ্যতা

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ইসলামের মধ্যে যেসব জিনিস হারাম, সেগুলোকে বর্তমান সভ্যতার অত্যাবশ্যকীয় ও অনিবার্য অনুষঙ্গ মনে করা হয়। যেমন : সুদ, উলঙ্গপনা, মদ, জুয়া ইত্যাদি।

আগের যুগে হিন্দু মহিলারাও নেকাব পরিধান করত। অথচ বর্তমানে মুসলমান মহিলারাও নেকাব পরিধান করে না। বর্তমানে তারা শুধু নেকাবের বাইরে নয়। পোশাক থেকেও বাইরে। স্রেফ পোশাক থেকেই বাইরে নয় বরং তারা নিজ স্বকীয়তা থেকেও বের হয়ে গেছে।

৩১. হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেয়ামত এর দিন পরস্পর পরামর্শ হবে যে, আজ আমরা সকলে মিলে আমাদের নিকট কোন নবী বা পথপ্রদর্শক আসার কথা অস্বীকার করব।

আল্লাহ তাআলা তো জানেন যে, তারা মিথ্যা কথা বলছে। তারপরও প্রমাণ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হযরত নূহ আ.কে উপস্থিত করা হবে। এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন হযরত নূহ আ. বলবেন : "আমি প্রায় এক হাজার বৎসর তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি।"

رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّ نَهَارًا ۝٥ فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْۤ اِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَ اِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَ اَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٧

অর্থাৎ, "হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত্রে এবং দিনে আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবানের দরুন তারা আরো দূরে সরে গেছে। আর আমি যখনই তাদেরকে ডেকেছি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তখনই তারা নিজ নিজ কর্ণসমূহে স্ব স্ব আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়িয়ে নিয়েছে আর তারা হঠকারিতা করল এবং চরম স্তরের অহংকার করল।" (সূরা নূহ, আয়াত ৫-৬-৭)

আল্লাহ তাআলা বলবেন : "হে নূহের সম্প্রদায়! তোমাদের নবী সাক্ষ্য দিচ্ছেন এখন তোমাদের কী বক্তব্য?

প্রহারকারীর হাত তো থামানো যায়, কিন্তু মিথ্যুকের যবানকে কিভাবে থামাবে?

হযরত নূহ আ. একেকজনের নিকট যাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন যে, হে অমুক! আমি কি তোমাকে দাওয়াত দেইনি? সে বলবে যে, আমি তো জীবনে তোমার আকৃতিও দেখিনি।

হযরত নূহ আ. বলবেন : "হে আল্লাহ! উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে জিজ্ঞেস করুন। এরা সর্বশেষ উম্মাত। সকলের অবস্থার ব্যাপারে অবগত"।

ফলে এখন উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, মুজতাহিদীন ও মুজাদ্দিদদেরকে ডাকা হবে। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তাঁরা সাক্ষ্য দিবেন যে, নূহ আ. সত্যবাদী। এবং তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী। এখন তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, মিথ্যা তার শরীরের অংশ হয়ে যায়।

তারা বলবে : এটা কেমন ইনসাফ? এরা আমাদের হাজারো বছর পর দুনিয়াতে আসল আর আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল! তাদের এ সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? যদি আমাদেরকে জাহান্নামে দিতেই চান এমনিই ফেলে দিন।

এখন উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার উলামা হযরতদের নিকট দলীল চাওয়া হবে, তাঁর আরয করবেন : ইয়া আল্লাহ! আমাদের দলীল হচ্ছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা। তিনিই আমাদেরকে বাতলিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা হবে। তিনি বলবেন : "আমার উম্মাত সত্য কথাই বলেছে।"

এখন তো এমন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেন যে, জমিন ও আসমান টলে যেতে পারে কিন্তু তাঁর সততা টলতে পারে না। হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায় বলবে: আপনিও তো হাজারো বছর পরে এসেছেন। আপনার সাক্ষ্য কিভাবে কবূল হবে?

এখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দলীল তলব করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করবেন, ইয়া আল্লাহ! আমার দলীল হল আপনার কালাম। আপনি বলেছেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ

"আর নিশ্চয়ই নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি।"

(সূরা হুদ, আয়াত ২৫)

জমীন ও আসমান টলতে পারে কিন্তু আপনার কালামের সততা টলতে পারে না।

এখন সরকার নিজেই দাবীকারী।

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

"আর আল্লাহর থেকে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?"

(সূরা নিসা, আয়াত ১২২)

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

"আর আল্লাহর থেকে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?"

(সূরা নিসা, আয়াত ৮৭)

যিনি সততার খাযানা তিনি বলে দিয়েছেন।

হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায় বলবে : ইয়া আল্লাহ! আপনিই দাবীকারী, আপনিই সাক্ষী, আপনিই জজ! এটা কেমন ফয়সালা? কেমন ইনসাফ?

জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তাহলে বলো তোমরা কিভাবে মানবে? তারা বলবে : যখন আমরা নিজেরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিব, তখনই কেবল অভিযোগ প্রমাণিত হবে। আমরা সাক্ষ্য না দিলে তো দাবীই প্রমাণিত হবে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত শরীরে বলার শক্তি ছড়িয়ে দিবেন। তাদের শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যা কুফর শিরকে পূর্ণ, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন। এখন যখন তাদের অঙ্গগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া আরম্ভ করবে। তখন তারা অঙ্গগুলোর উপর অভিশাপ দিয়ে বলবে : তোমাদের রক্ষা করার জন্যই তো আমরা মিথ্যা বলেছি। এখন তোমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

৩২. জনৈক দাড়ি মুণ্ডনকারীর মনোরঞ্জন

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : একদিন জনৈক দাড়িমুণ্ডনকারী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি হযরত আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ.-এর নিকট আসলেন। তিনি শরম পাচ্ছিলেন। তো হযরত শাহ ছাহেব রহ. তার মনোরঞ্জনের জন্য বললেন যে, ভাই! আমরা তো দাড়ি রাখি রুটি উপার্জনের জন্য। মোল্লা মানুষ দাড়ি না রাখলে তাকে রুটি দিবে কে?

৩৩. ভাল মানুষ ছাড়া ভাল নীতি বেকার

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : শুধু ভাল ভাল নিয়ম আর পদ্ধতির দ্বারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা আসতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো কার্যকর করার মতো ভাল মানুষ পাওয়া না যায়। সৎ মানুষ ছাড়া কোন মতবাদ প্রস্তুত হতে পারে না। সম্রাট আকবারের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত মোল্লা দোপিয়াজাহ লাগা ছিলেন অতক্ষণ পর্যন্ত আকবার সঠিক পথের উপর ছিল। যখন তিনি পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আকবার পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। নতুন ধর্ম বানাল দ্বীনে ইলাহী নামে। যার সংস্কার করেছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.।

৩৪. রাত্রের নাস্তা (?)

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : জনৈক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ.কে বলল যে, হযরত! আপনার কিতাব "নাশতায়ে লাইল" আমি দেখেছি। আমার খুব প্রিয় কিতাব সেটা।

হযরত থানভী রহ. রসিকতা করে বললেন : রাত্রিবেলা আবার নাস্তা হয় নাকি? নাস্তা তো দিনে হয়। পরে জানা গেল যে, সেটা হযরত থানভী রহ.-এর রচনা "ناشئة الليل" "নাশিয়াতুল্লাইল" (সূরা মুযযাম্মিলের ৬ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦ অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা অন্তর ও শব্দের সংযমের পক্ষে বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং শব্দ খুব ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়।" এই نَاشِئَةُ اللَّيْل কেই ঐ ব্যক্তি ناشتہ لیل বা রাত্রের নাস্তা (?) বলেছেন।

৩৫. ইনসাফ

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠিত থাকলে হক ও ইনসাফ কায়েম থাকে। আকলী বা যুক্তিসমৃদ্ধ আদালত প্রতিষ্ঠিত থাকলে নিরাপত্তা কায়েম থাকে। পক্ষান্তরে যদি উভয়টির কোনটিই না থাকে, তাহলে না থাকে শান্তি। আর না থাকে হক ও ইনসাফ।

৩৬. তাওয়াক্কুল

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : 'তাওয়াক্কুল' তো বুঝার জিনিস নয় বরং অবলম্বন করার জিনিস।

৩৭. দেশে বেবরকতী কেন ছড়িয়ে পড়ে?

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : যদি সরকারের নিয়্যত ভাল না থাকে, তাহলে বৃষ্টি বা ফসল হলেও বেবরকতী হয়। ঘটনা আছে, একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ জনৈক বাগানওয়ালার বাগানে প্রবেশ করলেন। তাঁর তৃষ্ণা পেয়েছিল। বাগানওয়ালার নিকট পানি চাইলেন। বাগানওয়ালা একটি ডালিম আনলেন। সেটার রস নিলেন তো পুরো গ্লাস ভরে গেল। বাদশাহ মনে মনে ভাবল, এই বাগানটা দখল করতে হবে।

এরপর যখন আবার পানি চাইলেন, তখন একটি ডালিমের রসে অর্ধেক গ্লাসও ভরল না!

বাগানওয়ালা বললেন : মনে হয় বাদশাহর নিয়্যত খারাপ হয়ে গেছে।

ফলশ্রুতিতে বাদশাহ নিজ নিয়্যত ঠিক করে নিলেন, এরপর যখন আবার ডালিম নিংড়ানো হল, তখন পুনরায় গ্লাস ভরে গেল।

৩৮. আপত্তি তোলা সহজ

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. বলতেন : ইলমী জিনিসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে

ফতোয়া দেয়া। এর থেকে সহজ হল দারস দেয়া। (পাঠদান করা) এর থেকে সহজ হল বয়ান করা। যদি ইলমী বয়ান না হয়।

একটা জিনিস সব থেকে বেশি সহজ। সেটা হল আপত্তি উত্থাপন করা। চাই আলেমের উপর করুক বা নবীর উপর কিংবা ইমামের উপর। এর মধ্যে ইলম থাকাও শর্ত নয়। বরং মূর্খতা যত বেশি, আপত্তি উত্থাপন করা তত বেশি সহজ।

সাধারণ মানুষ আপত্তি দ্রুত বুঝে ফেলে। দলীল প্রমাণ তো অনেক বিলম্বে ক্রিয়া করে। সাধারণ মানুষ বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করে না। ঝগড়ার দিকে বেশি মনোযোগী থাকে। লড়াই হলে সবাই বিদ্যমান। মিটমাট হয়ে গেলে সব উধাও।

৩৯. কুরআনে কারীমকে যে মানসিকতা নিয়ে দেখবে, ফলাফলও সেরকমই পাওয়া যাবে

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : যদি কেউ কুরআনে কারীমকে খ্রীস্টানসুলভ মন মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়ন করে, তাহলে প্রতিটি আয়াতে খ্রীস্টবাদ দেখবে। ইয়াহুদী মানসিকতা নিয়ে পাঠ করলে প্রতিটি আয়াতের দ্বারা ইয়াহুদীবাদ নজরে আসবে। পরিপূর্ণ তাওহীদ নিয়ে দেখবে, তো প্রতিটি আয়াত দ্বারা তাওহীদ বের হবে।

কবি আকবার ইলাহাবাদী রহ. বলেন :

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا + دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

কিতাব, ওয়ায বা সোনা দ্বারা নয়
বুযুর্গদের নযরেই দ্বীন পয়দা হয়।

আরেকজন ফার্সী কবি বলেছেন :

بنما بہ صاحب نظرے گوہر خودرا + عیسٰی نتواں گشت بہ تصدیق خرے چند

অর্থাৎ, "তুমি তোমার মূল পদার্থটি কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখাও, কয়েকটি গর্দভের সমর্থনের দ্বারা কেউ (ঈসা) বুযুর্গ হতে পারে না।

অন্তরকে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ না করবে, অতক্ষণ পর্যন্ত সহীহ ইলম সৃষ্টি হবে না।

৪০. দুনিয়ার জন্য কম এবং আখেরাতের জন্য বেশি কাজ করুন

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : দুনিয়াতে মাত্র কয়েকদিন আমাদের অবস্থান করতে হবে। এজন্য এখানের জন্য কাজও করতে হবে কম। পক্ষান্তরে আখেরাতে আমাদেরকে অনন্ত অসীম কাল থাকতে হবে। এজন্য সেখানের জন্য কাজও বেশি করতে হবে।

দুনিয়ার জন্য নিজ আসল ঠিকানা ভুলে যাওয়ার উদাহরণ হল এরূপ, যেমন কেউ রেলগাড়ীতে বসে সমস্ত উপার্জন রেলের মধ্যেই লাগিয়ে দিল। বগির সৌন্দর্য বর্ধনের পিছনে সমস্ত পুঁজি ব্যয় করে ফেলল! মানযিল আসার পরে সে রেলেরও থাকবে না, মানযিলেরও থাকবে না।

দুনিয়া আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু যতটুকু না হলেই নয়। আমাদের আসল গন্তব্যস্থল হল আখেরাত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "দুনিয়ার জন্য অতটুকু আমল কর যতদিন তুমি দুনিয়াতে থাকবে। আর আখেরাতের জন্যও অতটুকু কর যতদিন সেখানে থাকবে।

দুনিয়াকে লক্ষ্য বানানো ট্রেনকে বাসা বানানোর মত। যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী আখেরাতকে বাদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে লক্ষ্য বানাল,

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑪

"তার দুনিয়া ও আখেরাত সব ধ্বংস হয়ে গেল। এটাই চরম ক্ষতিগ্রস্ততা"।
(সূরা হজ্জ, আয়াত ১১)

৪১. আমরা দাসত্ব অর্জন করেছি প্রভুত্ব নয়

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : আল্লাহ পাকের নাম ছেড়ে দিলে শুধু অতঃপতন আর অধঃপতন। অভিজ্ঞতাও বলে যে, মুসলিম জাতি গত তিন চার শতাব্দী থেকে দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। পূর্বে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা মুসলমানদের পায়ে গড়াগড়ি খেত। অথচ বর্তমানে মুসলমানরা তাদের পায়ে গড়াগড়ি খায়। পূর্বে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদেরকে ভয় করত অথচ বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদেরকে ভয় করে।

মুসলমানরা পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য বাদ দিয়ে কিছুই অর্জন করতে পারেনি। বরং পূর্বসুরীগণ যা কিছু রেখে গেছেন, সেটাও খুঁইয়ে দিয়েছে।

আপনি আমেরিকা বা রাশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করবেন এই শক্তি আপনার নেই। এটা একটা ধোঁকা যে, আমরা উন্নতি করছি!

আমরা إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللهِ তথা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার মহান উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেছি, ফলে আমরা অধঃপতনের দিকে যাব না তো কোন্ দিকে যাব!

মহান আল্লাহর সামনে যারা মাথা নত করে, তাদের মাথাই উঁচু থাকে। যেমন পাহাড়ে আরোহন করার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে আরোহন করে। মানুষ যখন আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সামনে মাথা নত করে তখনই তার অধঃপতন হয়। যেমন পাহাড় থেকে নামার সময় অহংকারের সাথে নামে। এ পথ বড় বৈচিত্রময়।

৪২. ইসলামের 'শাসক' প্রজাদের আমল-আখলাক এমনকি ঘরোয়া যিন্দেগীরও দায়িত্বশীল হন

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ইসলামী হুকুমত মানব প্রকৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখে। এখানে রাজা হলেন মুরব্বীতুল্য।

হযরত উমর ফারূক রাযি. রাত্রিবেলা শহরে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের নেগরানী করতেন। এটাও দেখতেন যে, কোন বদআখলাকী তো ছড়িয়ে পড়ছে না?

একবার তিনি চক্কর দিচ্ছিলেন। একটি ঘর থেকে জনৈকা নারীর আওয়ায শুনলেন, যে প্রেমের কবিতা পাঠ করছিল। তিনি আওয়ায দিলেন যে, ঘরে কে আছ? নারীটি ভয়ে চুপ হয়ে গেল। সে চুপ থাকাতে আমীরুল মুমিনীনের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল যে, নিশ্চয়ই কোন একটা ব্যাপার আছে। বারবার অনুরোধ করার পরও নারীটি দরওয়াযা খুলেনি।

হযরত ফারূকে আযম দরওয়াযা বাদ দিয়ে অন্য পথে প্রবেশ করলেন। ঐ নারীকে জিজ্ঞেস করলেন : বল তুমি কেন এ সব গাইছিলে? এবং কেন দরওয়াযা খুলনি? নারীটি বলল : খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি তো ভুল করেছি একটি। কিন্তু আপনি ভুল করেছেন তিনটি।

হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন : আমি কী অন্যায় করেছি? নারীটি বলল : আপনি অনুমতি ও সালাম ব্যতীত প্রবেশ করেছেন। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুমতি ছাড়া ও সালাম দেওয়া ব্যতীত তোমাদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না।" (সূরা নূর, আয়াত ২৭)

দ্বিতীয় অন্যায় হল এই যে, আপনি দরওয়াযা দিয়ে প্রবেশ করেননি বরং দেয়াল টপকে প্রবেশ করেছেন। অথচ কুরআনে কারীমে আছে :

وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪

"তোমরা দরওয়াযা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো"।
(সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৯)

তৃতীয় অন্যায় হল এই যে, আপনি বেগানা নারীর নির্জনতায় প্রবেশ করেছেন। হাদীসে পাকে যেটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে :

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

"খবরদার! কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জনে না থাকে। কেননা এমনটি হলে সেখানে তৃতীয়জন হবে শয়তান।" (সহীহ ইবনে হিব্বান)

রাজা বা পুলিশের সন্দেহ হলে ঘরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ গুনাহের আকৃতির উপরও তাওবা করেন।

হযরত ফারুকে আযম রাযি. ঐ নারীটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নারীটি বললেন : আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ফারুকে আযম রাযি. ঘরে ফিরে সারা রাত নামায পড়তে থাকলেন এবং ইসতিগফার করলেন। অথচ এটা কোন গুনাহ ছিল না। রাষ্ট্রপ্রধানের এ অধিকার আছে। পরিশেষে অন্তরে এই প্রশান্তি আসল যে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর সকালে ঐ নারীর নামে সমন জারী করে দিলেন। সে উপস্থিত হল। আমীরুল মুমিনীন বললেন : বোন! আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করছি। তোমার কথার প্রেক্ষিতে আমি ইসতিগফার করেছি। তাওবা করেছি। এখন আমি আমীরুল মুমিনীন হিসেবে জিজ্ঞেস করছি : ঐ গান গাওয়াটা কি তোমার ঠিক হয়েছে?

নারীটি বললেন : আমীরুল মুমিনীন! আমি এক সতী নারী। আসল ঘটনা হল পনের দিন পূর্বে আমার বিবাহ হয়েছে। আমার স্বামীকে আপনি জিহাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার বিরহে আমি এ কবিতাগুলো পাঠ করছিলাম।

আমীরুল মুমিনীন বাসায় আসলেন। নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, একজন যুবতী স্ত্রী নিজ স্বামীর বিচ্ছেদের উপর কতদিন ধৈর্যধারণ করতে পারে? তিনি বললেন : চারমাস ধৈর্য ধরতে পারে।

ফলশ্রুতিতে হযরত ফারুকে আযম রাযি. নির্দেশ জারী করে দিলেন যে, কোন যুবক সৈনিক বা কর্মচারীকে চার মাসের বেশি আটকে রাখা যাবে না।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ব্যক্তিচরিত্রের সংশোধনও রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুদায়িত্ব। যাতে করে মানুষদের মধ্যে নফসের পূজা চলে না আসে। বরং একমাত্র আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৪৩. নারীদের শিক্ষা

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ জনাব মুহিউস সুন্নাহ চৌধুরী সাহেবের বাসায় মাস্তুরাতের ব্যাপারে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, “তালীমে নিসওয়ান” বা নারীশিক্ষা শিরোনামে সেটার সারাংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে। (সংকলক)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

অনুবাদ : অর্থাৎ “ তোমরা আল্লাহ তাআলার সেই আয়াতসমূহ (অর্থাৎ, কুরআন) এবং (শরীয়তের বিধানসমূহের) ঐ জ্ঞান যা তোমাদের গৃহসমূহে

চর্চা হয়ে থাকে, তা স্মরণ রেখো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ খবরদার”। (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৪)

আমার স্নেহের ভাই ও বোনেরা! এই সময় বড় উদ্দেশ্য হল মহিলাদের উদ্দেশ্যে কিছু বয়ান করা। পুরুষেরা বিভিন্ন স্থানে বয়ান শোনে। মহিলাদের সুযোগ হয় না। মহিলাদের ইজতিমা করে তাদেরকে দ্বীনের বিধিবিধান জানানো জরুরী।

আমার বোনদের অন্তরে ব্যাপকভাবে এই খেয়াল জমে গেছে যে, আমাদের কাজ হল শুধু ঘর সংসার করা, নামায পড়া আর সন্তানদের লালন পালন করা। এতেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। অন্যান্য গুণে গুণান্বিত হওয়া নারীদের কাজ নয়।

খারাপ মনে না করলে আমি বলব যে, এটা চুরি করার মত ব্যাপার। বাস্তবতা হল এই যে, যত স্তর পুরুষদের জন্য রাখা আছে, ঠিক ঐ পরিমাণ স্তর মহিলাদের জন্যও রাখা আছে। মহিলারা বড় বড় আলেমা ও আদীবা হতে পারে। কিছু কিছু দায়িত্ব আছে এমন যা মহিলাদেরকে দেয়া হয়নি। তাদেরকে নবুওয়াত দেয়া হয়নি। অবশ্য ইমাম দাউদ যাহেরী রহ.-এর মত হল মহিলারাও নবী হতে পারেন। তাঁর মত হল : হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আ.-এর আম্মাদ্বয় এবং ফিরআউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া নবী ছিলেন। অবশ্য মহিলাগণ স্বতন্ত্র শরীয়ত এর অধিকারিণী হতে পারবেন না, যে উম্মাতকে ধর্মোপদেশ দিবেন। মহিলা মুরব্বী হলে তার সামনে পুরুষও আসবে তখন আর পর্দা থাকবে না। তো এটা কৃপণতা নয়। বাস্তবিকপক্ষে এটা তাঁদের মর্যাদার উপযোগী নয়।

এমনিভাবে মহিলাদেরকে কাযী বা বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কাযী বানানো হলে পর্দা লংঘন করতে হত। বাদী বিবাদীকে দেখতে হত, তাদের কথা শুনতে হত, তাদের চেহারা দেখতে হত, ফলে পর্দা বলতে কিছু থাকত না।

মহিলাদের মধ্যে বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস গত হয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. অনেক বড় আলেমা ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “অহীর অর্ধেক ইলম আয়েশা থেকে অর্জন কর। আর অবশিষ্ট অর্ধেক অন্যান্য সাহাবী থেকে।” বড় বড় সাহাবী রাযি. তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন।

উম্মাতের উপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর এটা অনুগ্রহ যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করে অসংখ্য ইলমের দরওয়াযা খুলে দিয়েছেন।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : কারো দুগ্ধপোষ্য তিনটি সন্তান মারা গেলে সে পিতা মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দুটি বাচ্চা মারা যায়? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারও একই বিধান। হযরত আয়েশা রাযি. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : যদি একজন মারা যায়? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "এর বিধানও সেটাই"। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ)

এই শিশু আল্লাহ পাকের সাথে ঝগড়া করবে, জিদ করবে, পিতা-মাতার জাহান্নামে যাওয়ার পথে এই সন্তান প্রতিবন্ধক হবে। ফেরেশতারা বলবেন : তারা তো গুনাহগার। তাদেরকে কিভাবে জান্নাতে নিব? কিন্তু বাচ্চা জিদ করে বলবে : আমরা জাহান্নামে যেতে দিব না। ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার সামনে ব্যাপারটি পেশ করবেন। বাচ্চা আল্লাহ তাআলাকে বলবেন : যদি তাদেরকে জাহান্নামে পাঠাতে চান তাহলে আমাদেরকেও পাঠিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন :

أَيُّهَا الطِّفْلُ الْمُرَاغِمُ لِرَبِّه أَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ

"হে ঝগড়াটে শিশু! যাও তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও"।

(সুনানে ইবনে মাজাহ)

বলা হয়ে থাকে যে, তিনটি হাট প্রসিদ্ধ। ১। ব্লক হাট। ২। তিরয়া হাট। ৩. রাজহাট। একবার বাদশাহ আকবারের দরবারে বাচ্চাদের আলোচনা উঠল। কোন্ জিদ এমন আছে, যেটা পুরা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়?

এ ব্যাপারে আলোচনা হল। তখন মোল্লা দোপিয়াযাহ বললেন : বাচ্চাদের জিদ। এটা পুরা করা সবার কাজ নয়।

আকবার বললেন : আমি বাদশাহ। আমি পুরো করতে পারব।

মোল্লা বললেন : আচ্ছা, আমি বাচ্চা হয়ে জিদ করব। আপনি আমার জিদ পুরা করুন। মোল্লা দোপিয়াযাহ শিশুদের ন্যায় কাঁদতে থাকলেন : বলা হল : কাঁদছ কেন? বলো তুমি কি চাও? মোল্লা বললেন : হাতি চাই। আকবার হাতি দিয়ে দিলেন। মোল্লা পুনরায় কান্নাকাটি আরম্ভ করলে জিজ্ঞেস করা হল : কাঁদছ কেন? মোল্লা বললেন : 'হাতিটাকে খাঁচায় বন্দী করে দিন।" অথচ খাঁচায় হাতিকে বন্দী করা অসম্ভব। অবশেষে আকবার অপারগ হয়ে গেছে। যাইহোক, বাচ্চাদের জিদ আখেরাতেও কায়েম থাকবে।

এটা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর অনুগ্রহ যে, তিনি প্রশ্ন করে সহজ করে দিয়েছেন। এমনকি অসম্পূর্ণ বাচ্চাও যদি জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সেও

সুপারিশ করবে। হযরত আয়েশাও একজন নারী। কিন্তু অর্ধেক ইলম তাঁর নিকট। হযরত আয়েশা তো পবিত্র স্ত্রী। তাঁর মর্যাদা তো অনেক বেশি।

এবার হযরত জাবের রাযি.-এর স্ত্রীর ঘটনা শুনুন। হযরত জাবের রাযি.-এর সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসা চলছিল। ইতোমধ্যে হযরত জাবের রাযি.কে সফরে বের হতে হল। হযরত জাবের রাযি. স্ত্রীকে বললেন : বাচ্চার দিকে খেয়াল রেখ।

যখন তিনি সফর থেকে ফিরলেন তখন বাচ্চার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। মা বাচ্চাকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিল এবং হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, বাচ্চা কেমন আছে? স্ত্রী উত্তরে বললেন যে, আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছে। খানা পেশ করলেন। খানা শেষে স্ত্রী স্বামীকে বললেন যে, আচ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছে কোন আমানত রাখে এবং নির্ধারিত সময়ে আমানত ফেরত চায়, তখন সেটা ফিরিয়ে দেয়া জরুরী নাকি জরুরী নয়? স্বামী উত্তর দিলেন : অবশ্যই ফেরত দেয়া উচিত। স্ত্রী বললেন : ফেরত দিয়ে মনক্ষুণ্ন হওয়া উচিত? বললেন যে, না বরং শুকরিয়া আদায় করা উচিত। স্ত্রী বললেন : সন্তান আল্লাহর আমানত ছিল। আল্লাহর দূত এসেছেন এবং তাকে নিয়ে গেছেন। এখন এর উপর আমাদের খুশী হওয়া উচিত নাকি নাখোশ? হযরত জাবের রাযি. স্বীয় স্ত্রীর হস্তচুম্বন করে বললেন : "তুমি তো দুঃখ হালকা করে দিয়েছ।"

তো ইলম, আকল ও সুস্থ অনুভূতি না থাকলে স্বামীর অন্তরও খুশী করতে পারবে না। ঐ সুস্থ অভিরুচিসম্পন্ন স্ত্রী স্বামীর অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। দুঃখ হালকা করেছেন বরং তাঁর অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করেছেন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযি.-এর বিবাহ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বে হয়েছে। হেরা গুহায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়ে গেছেন। ঘরে ফিরে হযরত খাদীজা রাযি.কে বলেছেন :

زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ

"আমাকে চাদর পরিধান করাও। আমাকে চাদর পরিধান করাও"।

হযরত খাদীজা রাযি. বললেন :

كَلَّا وَ اللهِ مَا يَحْزُنُكَ اللهُ أَبَدًا لِأَنَّكَ تَصِلُ الرِّحْمَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

"কখনো নয়। আল্লাহ তাআলা কস্মিনকালেও আপনাকে বিপদে ফেলবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। মানুষের বোঝা বহন করেন। নিঃস্ব ব্যক্তিকে সহযোগিতা করেন। অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং বিপদ আপদে মানুষকে সহযোগিতা করেন।" (সহীহ বুখারী ১ : ৩)

অতঃপর হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরাকা বিন নাওফেল-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিভিন্ন অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলে ওরাকা বললেন : "ইনি হলেন (হযরত জিব্রীল আ.) সেই 'নামূস' বা ফেরেশতা যিনি হযরত মূসা আ.-এর নিকট আসতেন। আহা! যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দিবে তখন যদি আমি জীবিত থাকি বা আমার যৌবন অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আমি আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার সম্প্রদায় কি আমাকে বের করে দিবে? ওরাকা বললেন যে, "হ্যাঁ নবীদের সাথে এমন আচরণ হয়ে থাকে।"

তো একজন মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উৎসাহ দিলেন।

এই হল প্রথম স্তরের নারীদের কীর্তি। পরবর্তী যুগেও অনেক গুণসম্পন্না নারী উম্মাতের মধ্যে গত হয়েছেন।

হযরত ইমাম আবূ জাফর রহ.-এর কন্যা হাদীস লিখতেন।

"বাদায়িউস সানায়ে" গ্রন্থের লেখকের যুগে জনৈক আলেমের কন্যা ছিলেন। যিনি রূপ-গুণের পাশাপাশি বিদ্যা-বুদ্ধিতেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিবাহের জন্য প্রচুর প্রস্তাব আসল। মেয়েটি শর্ত দিল যে, "আমি তার সাথেই বিবাহ বসব যে ইলম কালামে আমার সাথে মোকাবেলা করতে পারবে এবং মোকাবেলায় তাকে বিজয়ী হতে হবে।"

ফলশ্রুতিতে বহু মানুষ আসল। কিন্তু সবাই ব্যর্থ প্রমাণিত হল।

মেয়েটি তার আব্বাকে বলল : "আপনি ঘোষণা করে দিন যে, উলামায়ে কিরাম ফিকহ শাস্ত্রে কিতাব লিখবেন। যাঁর কিতাব আমার পসন্দ হবে, তাঁর সাথে আমি বিবাহ বসব।"

উলামা হযরতগণ কিতাব রচনা করলেন। এর মধ্যে "বাদায়িউস সানায়ে"কে তিনি পসন্দ করলেন।

কিন্তু কিতাবটির লেখক আল্লামা কাসানী রহ. ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ। মেয়েটি তাঁর সাথে বিবাহ বসতে সম্মত হয়ে গেল। বিবাহ হয়ে গেল। মেয়ের

আব্বা যখন মেয়েকে জামাই-এর নিকট সোপর্দ করার জন্য আসলেন তখন জামাই বললেন : "আমি মসজিদের হুজরায় থাকি। আমি তাঁকে কোথায় নিয়ে যাব।"

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা উভয়কেই অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দান করেন। আর ইলম ও ফতোয়ায় তাঁদের উভয়ের সুখ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ে যে, যে ফতোয়ায় স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের স্বাক্ষর থাকত, একমাত্র সে ফতোয়াকেই গ্রহণ করা হত।

আমাদের নানীজান ছাহেবা হাদীস পড়ুয়া মহিলা ছিলেন। বিবাহ শাদীর সময় তিনি মিশকাত শরীফ নিয়ে যেতেন। বিবাহের পর মিশকাত শরীফ খোলার পর যে হাদীস বের হত তার উপর ওয়ায করতেন। এর দ্বারা হাজার হাজার মহিলার সংশোধন হয়েছে।

আমার কথার উদ্দেশ্য হল কোন নারী যদি যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমা হতে চায় তাহলে হতে পারে। নারী দ্বীনের পথে অগ্রসর হয়েছে, তো উঁচুমাকাম অর্জন করেছে। দুনিয়ার পথে অগ্রসর হয়েছে, তো উঁচু মাকাম অর্জন করেছে। অনেক মহিলা মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছেন। অনেক মহিলা মেম্বার হয়েছেন। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীও একজন নারী। অনেক নারী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। নারী যদি ইলম ও আমলে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায়, তাহলে অর্জন করতে পারে। বারো ঘণ্টার মধ্যে এক দুই ঘণ্টা পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাঠ করার দ্বারা নারী কি হাফেযা বা মুহাদ্দিসা হতে পারবে না?

ন্যূনপক্ষে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইলম তো অবশ্যই হাসিল করা উচিত। কমপক্ষে স্বামীর হক, সন্তানাদীর হক, ঘরের অন্যান্য সদস্যদের হক তো জানবে।

ইসলাম তো হকসমূহ আদায়ের নাম। দৈনিক একটি মাসআলা মুখস্থ করলেও সারা বৎসরে অনেক মাসআলা মুখস্থ হয়ে যাবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ أَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَلْتَدْخُلْ بِأَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمْنِيَةِ شَائَتْ.

অর্থাৎ "যে নারী পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ল, রামাযান মাসে রোযা রাখল, স্বামীর আনুগত্য করল এবং স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করল সে জান্নাতের আট দরওয়াযাসমূহের মধ্যে যে কোন দরওয়াযা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

নামায পড়তে কী সমস্যা? স্বামীর খেদমত সেরকম কোন কষ্টকর কাজ নয়। অনুরূপভাবে পুরো বছরে মাত্র একমাস রোযা রাখায় কী কষ্ট? মহিলারা তো এমনিতেই না খেয়ে থাকাকেই পসন্দ করে।

আখেরাতের জীবনকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। যা অনন্তকাল চলবে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আগামীতে আমাদের সামনেও ঐ মুহূর্তটি আসবে। আমরাও চলে যাব।

মহিলাদের উচিত নামাযের পাবন্দীর পাশাপাশি প্রত্যহ কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা।

একজন নেককার মহিলা ছিলেন। যিনি উযু করে পবিত্র কুরআনের উপর হাত রেখে বলতেন : "এটাও আল্লাহ সত্য বলেছেন। এটাও আল্লাহ সত্য বলেছেন।" এভাবে দৈনিক পবিত্র কুরআন খুলে তিনি খুব সম্মানের সাথে হাত ফিরাতেন।

বাচ্চাদের প্রথম মাদরাসা হল মায়ের কোল। মায়ের মধ্যে ইলম না থাকলে সন্তানরাও ইলম থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা হাফেয মাওলানা আহমাদ ছাহেব রহ. বলতেন : "বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরওয়াযা খোলো। মহান আল্লাহর হেফাযত তোমার সাথে শামিল হবে।"

পানি পান করে আমরা অনেকেই গ্লাস ঢেকে রাখি না। ভুলে যাই। আমার আব্বা রহ. বলতেন যে, রাত্রে আসমান থেকে অনেক রোগ ব্যাধি অবতীর্ণ হয়। যে পাত্র খোলা থাকে, তার মধ্যে রোগ ব্যাধি অবতীর্ণ হয়।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আর ব্যাপারে যে সব হাদীস আছে, সেগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে আদায় করুন। যদি শিশুদেরকে ইসলামী দুআসমূহ শিখিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এর মাধ্যমেই ইসলামী যিন্দেগী গঠিত হবে। যে কোন কাজ নেক নিয়্যতে সাওয়াবের উপলক্ষ হয়। খানা রান্না করার ক্ষেত্রে, কাপড় সেলাই-এর সময় স্বামীর আনুগত্যের নিয়্যত করবে। প্রতিটি কাজ সহীহ নিয়্যতে করলে পুরো যিন্দেগী ইবাদত ও মহান আল্লাহর আনুগত্যে পরিণত হবে।

নিজের সন্তানদেরকে প্রথম থেকেই খেদমত ও ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। এভাবে জাতির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শুধু আয়েশী জীবন বা ঘরে বেকার বসে থাকা থেকে তাদেরকে বাঁচাতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের উপর এবং পূর্বসুরী বুযুর্গানে দ্বীনের নকশে কদমে চলার তাউফীক দান করুন। আমীন।

৪৪. পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে জনৈক অমুসলিম ব্যক্তির মন্তব্য

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : জনৈক অমুসলিম পণ্ডিত বলেছেন : মনোবিজ্ঞান উন্মোচনকারী সর্বপ্রথম গ্রন্থ হল কুরআনে কারীম।

৪৫. আসল ইবাদত হল নামায

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : চরম পর্যায়ের অপদস্থতার শান পাওয়া যায় তো নামাযের মধ্যে পাওয়া যায়। এক হাত আরেক হাতের উপর বেঁধে দাঁড়ায়। রুকু করে। এর চেয়েও বেশি অপদস্থতা সেজদার মধ্যে। তার থেকেও বেশি অপদস্থতা দু'আর সময়।

যাকাত হল আল্লাহ পাকের মাখলূকাতের উপর অনুগ্রহ করা। এর দ্বারা আল্লাহ পাকের কাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক হয়। যাকাত ইবাদত হয় নির্দেশ পালনের কারণে। নতুবা যাকাত সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়।

অনুরূপভাবে রোযার শান হল পানাহার থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া। এটা হল মহান আল্লাহর সাথে অনুপম সম্পর্ক। এটা অসম্মান নয় বরং সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান। এটাও বাস্তবে ইবাদত নয়। মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের দরুন এটাও ইবাদত বনে গেছে।

অনুরূপভাবে সত্যকথা বলা মহান আল্লাহর শান। وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾ এবং وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾ "আর মহান আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে।" (সূরা নিসা, আয়াত ৮৭, ১২২)

এটা হল শানে খোদাওয়ান্দী। সত্য বলার দ্বারা মহান আল্লাহর শানের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হচ্ছে। নির্দেশ পালন করা একটি কাকুতি মিনতি। এর দ্বারা ইবাদত হচ্ছে।

হজ্বের মধ্যে আসল হল ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, দুই রাকাত নামায পড়া, আল্লাহ পাকের মহব্বতে সৌন্দর্যময় কাপড় পরিত্যাগ করা।

তাওয়াফ করা ও হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা হল আশেকের শান। اَلْحَجُّ شِعْثٌ "হজ্ব হল বিক্ষিপ্ততার নাম"। ভালো জিনিসের আশেক হওয়া বিরাট সম্মাননা। আল্লাহ পাকের আশেক হওয়ার চেয়ে বড় কোন মর্যাদা আর নেই। এটা সরাসরি সম্মান। কিন্তু নির্দেশ পালনের দরুন ইবাদত হয়ে গেছে।

নামায শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইবাদত। এর মধ্যে শুধু যিল্লত আর যিল্লত। যিল্লত ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই। নামাযের সমস্ত যিকির হয়তো মহান আল্লাহর বড়ত্ব অথবা নিজ অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ। ভঙ্গিসমূহের মধ্যে ইবাদতের শান। যিকিরসমূহের মধ্যেও ইবাদতের শান।

যাকাতের মধ্যে বান্দার সাথে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। রোযার মধ্যে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করে। নামাযের মধ্যে একমাত্র মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পয়দা করা হয়। এ জন্যই সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকে নামাযের পাবন্দ বানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ "প্রত্যেকেই তার নামায ও তাসবীহ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে গেছে।" (সূরা নূর, আয়াত ৪১) এটা বলা হয়নি كُلٌّ قَدْ عَلِمَ زَكَوٰتَهُ যে, সবাই নিজ যাকাত সম্পর্কে ভালভাবে জেনে গেছে। বা كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَوْمَهُ "সবাই স্ব স্ব রোযা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়েছে।" বা كُلٌّ قَدْ عَلِمَ حَجَّهُ তথা "সবাই আপন হজ্ব এর ব্যাপারে জানতে পেরেছে"। ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়নি।

অন্যান্য জিনিসগুলো ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে ইবাদত হয়। প্রকৃত ইবাদত নয়। এটা মনে করে নামাযে দাঁড়াবে যে, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের এটাই মাধ্যম। রোযা, হজ্ব স্থায়ী নয়। পক্ষান্তরে নামায দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করা হয়েছে। ইবাদত সব সময় হতে পারে।

৪৬. ফিতনার সময় করণীয়

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : যখন মানুষ মহান আল্লাহর নিয়মকানুন ছেড়ে দিয়ে মনগড়া আইন কানূনের পিছনে চলে, তখনই ফিতনা আসে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যখন ফিতনা আসে তখন মানুষ ঐ জিনিসেরই শরণাপন্ন হয় যা ফিতনার উপলক্ষ বা মাধ্যম।

জনৈক উর্দূ কবি বলেন :

میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب + اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

মীর! কতইনা সহজ সরল মানুষ! যার কারণে অসুস্থ হল, সেই আতর ব্যবসায়ীর ছেলে থেকেই ঔষধ নিচ্ছে!

৪৭. চার শ্রেণী আল্লাহ পাকের পুরস্কারের যোগ্য

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : কুরআনে হাকীমের মধ্যে এমন চার শ্রেণীর মানুষের কথা এসেছে, যাঁদের উপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿۶۹﴾

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা ঐ সব মানুষদের সাথে থাকবে যাদের উপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালিহগণ। আর বন্ধু হিসেবে এরা কতইনা উত্তম।" (সূরা নিসা, আয়াত ৬৯)

হাযারাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. ইলমের মধ্যে আসল। সিদ্দীকগণ তাঁদের অনুগত। নবুওয়াত সর্বশীর্ষ পদ। 'সিদ্দীকিয়্যাত' এর থেকে নিচে। এটাই হল ইলমী তারতীব বা জ্ঞানের ধারাবাহিকতা।

তো প্রথম স্তর হল নবীগণের। দ্বিতীয় স্তর হর সিদ্দীকগণের। তৃতীয় স্তর হল শহীদগণের। আর চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তর হল সালিহগণের।

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا

"তোমরা মারা যাওয়ার পূর্বে মারা যাও"।

সূফিয়ায়ে কিরাম কঠিন কঠিন মুজাহাদার মাধ্যমে নফসের প্রবৃত্তিকে খতম করে দেন। শহীদ তো নিজ জীবনেকেই শেষ করে দেয়। শহীদ জীবনের কুরবানী দিয়ে ফিতনাকে মিটিয়ে দেয়। যাতে করে আল্লাহর বান্দা ও বান্দীগণ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

যদি ফিতনা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ফিতনার সময় না তো নামাযের মধ্যে মন বসবে আর না কোন ইবাদত সুষ্ঠুভাবে হবে। নিরাপত্তা থাকলেই ইবাদত হবে। শহীদ স্বীয় জীবনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা দূর করে। তখন 'সালিহীন' তথা নেককারগণ কাজ করার সুযোগ পান।

তো ইলমের মধ্যে নবীদের অনুগামী হলেন সিদ্দীকগণ। আর আমলের মধ্যে শহীদদের অনুগামী হলেন সালিহগণ।

৪৮. দেশের উন্নতির ভিত্তি হল চারটি জিনিস

হযরতওয়ালা হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেন : ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ বলেছেন যে, চারটি জিনিসের উপর দেশের উন্নতির ভিত্তি।

(১) আলেমদের ইলম। (২) ধনীদের দানশীলতা। (৩) প্রশাসকদের ইনসাফ। (৪) ফকীরদের দু'আ।

যদি এই চারটি জিনিসের উপর আরেকটি জিনিস বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর সেটা হল (৫) জ্ঞানী মানুষদের অনুভূতি।